আমি ছিলাম

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

পরিবেশক :
জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা

উৎসর্গ

যাঁরা ছিলেন
যাঁরা আছেন
যাঁরা হবেন
তাঁদের হাতে সমর্পণ ক'রলাম এই বই,
এই আশায়—যে তাঁরা স্মরণ ক'রবেন যে
আমিও ছিলাম।

গ্রন্থকার

১

মরে গেলেও কি মানুষ বেঁচে থাকে? লোক বলে, থাকে—আর এখানেই ঘোরাফেরা করে। থাকে কি না জানি না, কিন্তু না থাকাই তার উচিত। এ আমার ভুক্ত ভোগীর অভিজ্ঞতা।

না, আমি মরিনি, বেঁচেই আছি। আশী বৎসর পার হ'য়ে গেছে, তবু মরিনি। ছেলেবেলায় কবিতা লিখতাম। একটার কয়েকটা চরণ মনে হ'চ্ছে।

মুক্তি চাই? বদ্ধ হ'তে? কেন?
এমন সুন্দর ধরা, উদার অম্বর,
ফল ফুলে ভরা এই স্নিগ্ধ বসুন্ধরা
এত স্নেহ এত প্রেম বন্ধু পরিজন
প্রিয়ার কোমল কান্ত মুগ্ধ আলিঙ্গন—
এ যদি বন্ধন তবে তুলা এর নাই
এ প্রিয় শৃঙ্খল হ'তে মুক্তি নাহি চাই।

ভুল লিখেছিলাম।

নিজের হাতে ক'রেছিলাম যে ফুলের বাগান শুকিয়ে গেছে তা', যে সব চারা পুঁতেছিলাম, জীর্ণ হ'য়ে গেছে— মুছে গেছে বসুন্ধরার মুখ হ'তে সেদিনের মায়া-প্রলেপ। সে দিনের সে বন্ধু পরিজন, সেই প্রিয়া গেছে চ'লে কোন নিরুদ্দেশ যাত্রায়।

আমি প'ড়ে আছি একা।

ঝরা মরা বাগানের বুকে ঐ বৃদ্ধ জীর্ণ আমগাছটীর মত।

একদিন ও ছিল ফলে ফুলে ভরা। ওর মুকুলের গন্ধে ছুটে আসতো ভ্রমর গুনগুনিয়ে ; ফলের রসে আকুল হ'ত লোক।

আজ ওর ফলের দিন ফুরিয়ে গেছে। মুকুল ওর ফোটে না। তবু ও দাঁড়িয়ে আছে নিষ্ফলতার বিজয় পতাকার মত।

তেমনি আছি আমি।

দুনিয়ার সাথে, কি জানি কেন, আমার আর বনছে না। তাই তল্পী বেঁধে ব'সে আছি পারঘাটে মাঝির প্রতীক্ষায়—আর মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখছি অতীতের দিকে। বর্তমান যার নেই ভবিষ্যৎ বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে, অতীতই যে তার একমাত্র সম্বল।

চিরদিন এমন ছিলনা। একদিন লোকে আদর ক'রে আমায় বহু সম্মান দিয়েছে। সে সম্মান আমাকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দেয়নি, তবু তাতে আনন্দ পেয়েছি। তখন উৎসাহভরে জগৎকে দিতে পেরেছি নিত্য নূতন দান, দিয়েছি নিত্য নূতন সেবা।

লোকের সম্মান হঠাৎ মিইয়ে এলো। তখনও আমার দানের শক্তি ছিল অটুট, সেবার উৎসাহে কোনও ত্রুটি আসে নি। কিন্তু সমাদর গেল ধীরে ধীরে লুপ্ত হ'য়ে। আর আজ, দুনিয়া আমাকে বরদাস্ত করে শুধু, আদর ক'রতে পারে না।

কোথা থেকে ভীড় ক'রে এলো নূতন সব লোক যারা জগতের সব সমাদর লুট ক'রে নিয়ে গেল, আমার জন্য অবশিষ্ট রইলো না কিছুই।

প্রথমে ওতে হ'ত রাগ, অভিমান। সেই অভিমানে যারা আজকে লোকের মাথার মাণিক তাদের যে সে সমাদর লাভ করবার যোগ্যতা ও কৃতিত্ব আছে তাও স্বীকার ক'রতাম না।

জগৎ আমাকে অবহেলা করে, আমার কৃতিত্বের যোগ্য সম্মান দেয় না, তাতে ক্ষিপ্ত হ'য়ে যেতাম—বিক্ষুব্ধ আক্রোশে আরও দুর্ধর্ষ চেষ্টা ক'রতাম আদর কেড়ে নেবার।

আজ সে ক্ষোভ নেই, সে ক্রোধ নেই। অভিমান নেই তা ব'লতে পারি না।

এখন ও ভাবি আমি যে আমার যে শক্তি ও প্রতিভা ছিল, আর যা' এখনো আছে ব'লেই ভাবি তার মূল্য দিতে জগৎ ভুলে গেছে। কিন্তু আজ তাতে তাদের দোষ দিতে পারি না।

চারিদিকে চেয়ে আজ দেখি—সে দুনিয়া তো নেই। যাদের চোখে আমি ছিলাম একটা বিস্ময়, যৌবনে আমার গৌরবের সাথী বা গুণমুগ্ধ সহচর বা অনুচর ছিল যারা, তাদের একটি লোকও তো বেঁচে নেই। আজকের ব্যতিব্যস্ত পৃথিবী আজকের দেবতার মন্দিরে ভীড় ক'রে আছে—সময় যে নেই তাদের বর্তমানের গর্ভ খুঁড়ে অতীতের খনি থেকে আমার কৃতিত্ব বের করবার। তাদের চোখে আমি লুপ্ত। আমার দান তারা তুচ্ছ করে। আমাকে পাশ কাটিয়ে তারা ব্যস্ত আবেগে ছুটে চ'লেছে "নয়ী রোশনীর" দিকে।

তাই আজ যারা লোকসমাদরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত তাদের প্রতি আর অবজ্ঞা বা হিংসা হয় না আমার। একদিন তাদের যোগ্যতা ও শক্তি সম্বন্ধে ছিলাম উদাসীন.—আজ তাদের প্রতি সুবিচার করতে পারি আমি। এ কথাও স্বীকার ক'রতে আমার কষ্ট হয় না যে তাদের শক্তি ও প্রতিভা আমার চেয়ে হয়তো বেশী—হয় তো তারা সত্যই বেশী সমাদরের যোগ্য! জগতের কাছে আমার দাবী যতটা প্রসারিত ক'রে দেখতাম, এখন তা দেখি না। এখন সে দাবীর সীমা ঠিক বুঝতে শিখেছি।

তবু মনে হয়, কেন আমি জগতের দৃশ্যপট থেকে একেবারে মুছে গেলাম? কেন লুপ্ত হ'য়ে গেল আমার সেই আকর্ষণ যাতে সমাদর টেনে আনতো? কেন আমি হ'য়ে রইলাম বহু পুরাতন, মিলিয়ে যাওয়া ফোটোর মত শুধু অতীতের ছায়া মাত্র হ'য়ে।

মমির মত অসাড় তো আমি নই। দেহের শক্তি ক্ষয় হ'য়েছে কিন্তু অন্তর তো এখনও তাজা আছে। ভালমন্দ বিচারের শক্তি আমার আছে অনেকের চেয়ে বেশী, ভালবাসবার আকাঙ্ক্ষা আছে, হিংসা করবার শক্তিও যে নেই তা নয়—তবু সবই যেন নিষ্ফল অসার্থক।

মনে হয় আমি বন্দী, আমার কারাগারের প্রাচীর পাষাণের নয়, স্বচ্ছ

স্ফটিকের। তার ভিতর দিয়ে দেখতে পাই জগতের লোকের আনা-গোনা উজ্জ্বল আলোর জগতে, যারা যায় আসে তারা আমাকে দেখতে পায় না। ডাক ছেড়ে বলি তাদের আমার প্রাণের আবেদন, স্ফটিক প্রাচীরে প্রতিহত হ'য়ে ফিরে আসে আমার বাণী—তাদের কানে পেঁাছোয় না। হাত বাড়িয়ে তাদের আলিঙ্গন ক'রতে যাই যারা আমার মনের মত, হাতে ধ'রে ফেরাতে চাই তাদের যারা আমার চক্ষের সামনে অন্ধ বিশ্বাসে আনন্দে ধেয়ে চ'লেছে অতলস্পর্শ গহ্বরের মুখে—সে হাত আঘাত খায় শুধু সে প্রাচীরে, তাদের স্পর্শ ক'রতে পারে না। ব্যর্থ আকিঞ্চন ফিরে এসে প্রাণের ভিতর তোলে ঝড়, তোলপাড় ক'রে দেয় সমস্ত অন্তরকে। পদাঘাতে চূর্ণ ক'রে ফেলতে যাই সে প্রাচীর—আঘাত খেয়ে পা' ফিরে আসে। অক্ষম রোষ, ব্যর্থ আকুতি শুধু অন্তরকে দগ্ধ ক'রে দেয়।

জগৎ চ'লেছে, যেমন চ'লতো আগে, মানুষ ছুটে চ'লেছে ঠিক আগের মত, তাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা মেটাবার দুর্ধর্ষ উৎসাহে, তাদের প্রাণের ছোট বড় সব রকম তৃষ্ণা মেটাবার আকুল আকাঙ্ক্ষায়, তাদের চ'খের সামনে জ্বলছে যে স্বপ্নদৃষ্ট আলোক, তারা জানেও না যে সেটা আলো নয়, আলেয়া। ঝাঁপিয়ে প'ড়ছে তারা পঙ্কে। সাবধান করি তাদের চীৎকার ক'রে—সে চীৎকার পেঁাছোয়না তাদের কানে।

আমার বর্তমানের স্বরূপ ক্রমে ফুটে ওঠে দিব্যচক্ষে। এদের চক্ষে আমি নেই। আমিও অনুভব করি আমি ছিলাম, এখন আর নাই।

তবে এ কার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বেঁচে আছি? এই জীর্ণ শরীরের সূক্ষ্ম সূত্র এ কী অলঙ্ঘ্য বন্ধনে বেঁধে রেখেছে আমাকে বর্তমানের সঙ্গে! মনে হয়, কত দিন বইতে হবে এ ভূতের বোঝা?

ফ্লানেল জড়ান বাতে কাতর পা খানি ইজি চেয়ারের হাতলের উপর তুলে দিয়ে এক অন্ধকার সন্ধ্যায় একা ব'সেছিলাম আমার ঘরে, অতীতের বিজৃম্ভনবহুল অবিচ্ছেদ ক্লান্তিকর বিশ্রামে মগ্ন হ'য়ে।

বাইরে বারান্দায় অভিজিতের সাড়া পেলাম। ডাকলাম।

"দাদাম'শায় ডাকছেন?" ব'লে আমার দৌহিত্র এসে বাতির সুইচ টিপে দিয়ে দাঁড়াল পরিপূর্ণ যৌবনের চাঞ্চল্যময় উজ্জ্বল অশান্ত মূর্ত্তি।

"কখন এলি?" জিগ্‌গেস ক'রলাম।

"এসেছি ঘন্টাখানেক আগে, এখন যাচ্ছি। সুকুমারদা'র কাছে একটু কাজ ছিল।"

একটু খোঁচা খেলাম। একঘন্টা আগে এসেছে সে—আমার খোঁজ নেওয়াও আবশ্যক মনে করেনি। সুকুমার আমার পৌত্র। লেখাপড়া কৃতিত্বের সঙ্গে শেষ ক'রে দেশের কাজ নিয়ে সে সদা ব্যস্ত। দেশে যতগুলি দল আছে সুকুমার চঞ্চল হ'য়ে একটার পর আর একটায় ভিড়ে এখন কমিউনিষ্টের ডাঙ্গায় এসে ঠেকেছে। তার জীবনটা বেদের নৌকার মত—একঘাটে বেশী থাকতে পারে না। যখন যে দলে সে থাকে দিনরাত ক'রে খাটে, সহজে নেতৃত্ব করে। লেখে, বক্তৃতা করে—আর কিছু করবার সুযোগ তার হয় না।

জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "কি কাজ?"

ব্যস্তভাবে অভিজিৎ ব'ল্লে, "সে অনেক কথা দাদাম'শায়, কাল ব'লবো। এখন বড় তাড়া। ওরা একটা বড় মীটিং ক'রেছে—সেখানে যেতে হবে।"

"ওরা কারা?"

"ওই যারা বলে সোস্যালিষ্ট—যত সব ভণ্ডের দল! বুর্জোয়া, আগাগোড়া বুর্জোয়া—কেবল গভর্ণমেন্টকে খুসী ক'রে সুবিধা বাগাবার চেষ্টা।"

"তবে তোমরা তাদের মীটিং-এ যাচ্ছ কেন?"

হেসে অভিজিৎ ব'ল্লে, "দক্ষের যজ্ঞে শিব যেমন গিয়েছিলেন! তাই সুকুমারদা'কে ব'লতে এসেছিলাম।"

"কিন্তু পরের যজ্ঞ নষ্ট না ক'রে নিজের কাজটা ক'রে যাওয়াই ভাল নয় কি?"

"কী যে বলেন দাদাম'শায়। ওদের দলটা চূর্ণ না ক'রতে পারলে কাজ ক'রবো কি আমরা? কাদের নিয়ে ক'রবো? আপনাদের দিন কাল নেই দাদাম'শায় যখন ভাল মানুষীতে কাজ হ'ত। এখন দাঁত না দেখালে বাঁচবারই

উপায় নেই। তা ছাড়া আপনাদের ঐ রিফর্মিষ্ট মনোভাবটাই আজকালকার দিনে অচল। যখন শ্রমিকেরা ছিল পদানত পরিভূত তখন এসব দিয়ে তাদের স্তোক দেওয়া চ'লতো, আজ প্রলেটেরিয়াটের জয়যাত্রার দিনে, যখন শ্রমিক সচেতন হ'য়েছে তাদের প্রচণ্ড শক্তি সম্বন্ধে তখন রিফর্মিজম উন্নতির পথে শুধু বাধাই সৃষ্টি ক'রতে পারে সমাজকে পিছু টেনেই রাখতে পারে এগিয়ে দিতে পারে না এক চুলও।"

আমি ব'ল্লাম, "কিন্তু কারও মতামতের গায়ে ঐ বুর্জোয়া. রিফর্মিষ্ট প্রভৃতি লেবেল এ'টে সমালোচনা করার চেয়ে বিষয়-বস্তুটার আলোচনা করাটাই কি সঙ্গত নয়?"

"এ সব আলোচনা বহু হ'য়ে গেছে দাদু, মার্কস্ লেনিন, ষ্টালিন বুখারিন, প্লেখানভ আরও কত—এ সব নিয়ে অনেক কথা কাটাকাটি ক'রে গেছেন। এখন আর ও নিয়ে যুক্তিতর্কের অবসর নেই।"

আমি ব'ল্লাম, "তর্কের অবসর থাক বা না থাক, বিবেচনার অবসর চিরদিনই থাকবে। ওরা কি ক'রতে চায়, সেটা ভাল কি মন্দ তা একবার—"

এতক্ষণ ছট্ফট্ করছিল অভিজিৎ, এইবারে সে ব'ল্লে, "বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে দাদাম'শায়—এখন আমি চলি।"

তীব্র বেগে সে বের হ'য়ে গেল।—আমার কথাটা শেষ ক'রতে দেওয়াও সে আবশ্যক মনে ক'রলে না।

একটু পরেই বুঝতে পারলাম যে সুকুমার নিঃশব্দে অন্য পথে বাড়ী থেকে চ'লে গেল।

সুকুমার আমার সামনে অন্ততঃ অভিজিতের মত স্পষ্ট কথা কখনও ব'লতে পারে না। একটুখানি সমীহ করে সে আমায়. তাই আমার কাছে তার সংকোচের অন্ত নাই। আমার সঙ্গে তার মত মিলবে না তা' সে ধ'রেই নেয়। আর আমাকে যে বোঝান যাবে না—বুড়ো মানুষেরা এমন একগ'ুয়ে যে তাদের বোঝান কিছুতেই যায় না,—তাও সে স্বতঃসিদ্ধ ব'লে মেনে নেয়। তাই সে কোনও কথা নিয়ে আমার সঙ্গে তর্কও করে না, অভিজিতের মত আমার মতকে

অগ্রাহ্যও করে না। সে শুধু আমাকে এড়িয়ে যায়—তার মতামত, কাজকর্ম সবই আমার কাছে গোপন ক'রে যায়। নিজেকেও যথাসাধ্য গোপন ক'রে রাখে। যখন দেখা হয় তার সঙ্গে তখন আমি যে কথাই বলি সে ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে যায় শুধু, কিন্তু কাজের বেলায় সে কথা মানে না কোনও দিন।

তার মনের ভাবটা আমি বুঝতে পারি। আমার বার্দ্ধক্যের নির্বুদ্ধিতা সে স্বীকার ক'রে নেয় একটু অনুকম্পার সঙ্গে। বুড়ো মানুষকে ঘাঁটিয়ে কষ্ট দিতে তার করুণায় বাধে। তাই মনে মনে তার যতই বিরোধ জাগে ততই সে সেটাকে চাপা দিতে চায় শুধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি দেওয়ার ভান ক'রে।

এরা দুজন চলে গেলে ভাবতে লাগলাম অভিজিতের কথা নিয়ে। অভিজিৎ ও সুকুমার দুজনেরই যখন যে মত হয় সেটা একেবারে চরম—যাকে ইংরাজীতে বলে downright. যখন যে মত তারা গ্রহণ করে তখন তার বিরুদ্ধে যে কোনও বিবেচনা করবার মত কথা থাকতে পারে তা এরা কল্পনাও করতে পারে না। যখন তেমন কোনও কথার আভাসও কা'রও মুখে টের পায় তখনই, বুর্জোয়া, রিফর্মিষ্ট প্রভৃতি রাশিয়ার আমদানী নূতন গালাগালের লেবেল দিয়ে তাকে উড়িয়ে দেয়, যেন তার উপর কোনও কথা হ'তেই পারে না। নিজেদের মতের সম্বন্ধে এই দৃঢ় নিশ্চয়তার সঙ্গে সঙ্গে আছে সেই মতটাকে কাজে লাগাবার জন্য একটা উগ্র উৎসাহ ও উদ্দীপনা। একমুহূর্ত ব'সে ভাবতে এরা চায় না, চায় শুধু ছুটোছুটি করে কাজ ক'রতে।

নিজের যৌবনের কথা মনে প'ড়লো। ঠিক এমনি উৎসাহ এমনি উদ্দীপনা নিয়ে আমি দিনরাত কাজ করবার জন্য ব্যস্ত হ'তাম। চঞ্চলতার আমার সীমা ছিল না।

কলেজ ছাড়বার আগেই স্থির ক'রেছিলাম যে এই দুনিয়ার সৃষ্টি স্থিতির দায়িত্ব যাঁরই হোক, তাঁর হাতে শক্তি ও উপাদান ছিল অশেষ, তাঁর কাজের অদ্ভুত কারিগরিরও অভাব নাই, কিন্তু তাঁর বিবেচনাটা সেই পরিমাণে প্রখর ছিল না। তাই দুনিয়ার কোনও ব্যবস্থাটাই ঠিক যেমনটি হ'লে ভাল হয় তেমনটি কোথাও ক'রে উঠতে পারেননি। আমার শক্তি সে তুলনায় বড্ড কম, আর জীবনও

অন্যায় রকম হ্রস্ব। তবু তখনই আমার সংকল্প হ'য়েছিল যে সামান্য যে ক'টা বছর আয়ু আমার, তাতে যেটুকু শক্তি আমার আছে তাই দিয়ে এমন কাজ ক'রে যাব যাতে জীবনের যাত্রা সুরু ক'রেছিলাম যে জগতে তার অনেকটা উন্নতি ক'রে বিদায়কালে তার চেয়ে ভাল একটা রেখে যাব আমার পরবর্তীদের জন্য।

আমাদের সে যুগটাই ছিল এমনি আদর্শবাদের যুগ। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের প্রথম উগ্র বিদ্রোহ তখন কেটে গেছে। দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর তখনও বেঁচে। সুরেন্দ্রনাথ তখন ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডির জীবনকে লক্ষ্য ক'রে ভারতের প্রান্ত থেকে প্রান্ত পর্যন্ত জাগিয়ে তুলছিলেন, স্বাধীনতা, জাতীয়তা ও দেশপ্রেমের জন্য ত্যাগের আদর্শ, মাতিয়ে তুলছিলেন যুবকদের। কেশবচন্দ্র সমস্ত দেশময় যে বিরাট আন্দোলন চালিয়েছিলেন ব্রাহ্মধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সুনীতি, শুচিতা ও মাদক নিবারণের প্রচারের, তার প্রাণবান প্রভাব ব্রাহ্মসমাজের বাহিরেও সমস্ত যুবসমাজকে অল্প বিস্তর অনুপ্রাণিত ক'রেছিল। আমাদের সমস্ত আবহাওয়ার ভিতর ছিল এমনি বিচিত্র চঞ্চল আদর্শের অনুপ্রেরণা। বিদ্যার সাধনা ছিল একটা প্রচণ্ড নেশা, সে বিদ্যার ভিতর উপনিষদের ব্রহ্মবাদ থেকে কোম্‌তের পজিটিভিজম পর্য্যন্ত সব বিদ্যাই ছিল : তখনকার দিনে বিজ্ঞান যতখানি ছিল সবটুকুই ছিল।

এই আবহাওয়ার ভিতর মানুষ হ'য়ে আমি এবং আমার অনেকগুলি বন্ধু হ'য়ে উঠেছিলাম ঘোরতর আদর্শবাদী। বিদ্যার শেষ সীমায় আরোহণ ক'রবো, চরিত্র গৌরবে গৌরবান্বিত ক'রবো দেশকে, দেশের পরাধীনতা, দীনতা মোচন ক'রবো, সমাজের সব ক্লেদ সব দুর্নীতির উচ্ছেদ ক'রে সচ্চরিত্র, সত্যনিষ্ঠা, সদাচার ও জীবনের শুচিতার সাধনা ও প্রচার ক'রবো এমনি সব আদর্শ ছিল আমার মনে। দেশকে সেবা ক'রবো সর্বাঙ্গীনভাবে, তাকে "জগত মাঝারে শ্রেষ্ঠ আসন" দেবো এই ছিল আমার সংকল্প।

তাই শৈশব ও প্রথম যৌবনের যে সব অনিবার্য্য বাধা ও বোঝা তার থেকে মুক্তি পেতে না পেতে লেগে গেলাম দুনিয়াটার উন্নতির কাজে। হাতে

সময়টা যে বড় কম সে বোধটা আগাগোড়াই ছিল তাই কাজের তাড়াটা ছিল বিষম। আর সেইজনাই নিজের ছোট্ট দুটো হাত চারদিকে ছড়িয়ে দিয়ে অর্জ্জুনের সহস্র বাহুর কাজ করবার চেষ্টা ক'রেছিলাম।

আজ সে সব চুকে বুকে গেছে, শান্ত হ'য়ে হিসাব-নিকাশ করবার সময় হ'য়েছে। নিকাশ ক'রে দেখতে পাচ্ছি—সারা জীবন ভ'রে শুধু ভস্মেই ঘি ঢেলেছি। দুনিয়াটা ভাল কি মন্দ হ'য়েছে বলা ভার। যদি বা ভাল কিছু হয়ে থাকে সে আমার হাতে হয়নি। না হবার কারণ যে শুধু আমার অযোগ্যতা একথা এখনও ভাবতে পারি না।

রাশিয়া থেকে আমদানী করা বিদ্যার আজ ভারী আদর। সেই বিদ্যার জৌলুষে অন্ধ যুবাজগৎ আজ আমার সঙ্গে কোনও কথা বিচার করাটাও সময়ের বাজে খরচ মনে করে। ভাবটা এই যে আমি এ সব কথার কী বুঝবো ? কিন্তু এদের বাপমাদের জন্মের আগে আমি যে এদেশে সোস্যালিজাম প্রচারের ব্যর্থ চেষ্টা ক'রেছিলাম সে কথা এরা জানেও না। আমার সে সব কথা তখন কেউ শোনেনি। যদি শুনতো, তবে আজকের অনেক সমস্যা জন্মাতই না।

তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি একটা স্বতন্ত্র পাঠ্য বস্তু ছিল না। ইতিহাসের সঙ্গে কিছু পলিটিক্স ও ইকনমিক্স পড়ান হ'ত। তাতে যে সব বই পড়ান হ'ত তাতে সোস্যালিজ্‌মের নাম মাত্র ছিল, তার আলোচনা, ব'লতে গেলে, ছিলই না। ইতিহাসের যে মুষ্টিমেয় ছাত্র ইকনমিক্স প'ড়তো তার বাইরে কেউ সোস্যালিজমের খবরও জানতো না। মার্কস বা এঙ্গেলসের নামও শোনেনি কেউ। রাশিয়ার বিপ্লব তখন ছিল সে দেশের মুষ্টিমেয় নির্বাসিতদের সুদূর স্বপ্নমাত্র।

তখন আমি দেশের সেবার স্বপ্নে মশগুল, অতন্দ্র নিষ্ঠার সঙ্গে পড়ছি জগতের সব দেশের সমাজ-তত্ত্ব ও অর্থনৈতিক সাহিত্য আর শুকনো বালির মত শুষে নিচ্ছি নিজের ভিতর, যেখানে যে তত্ত্ব পাচ্ছি। সেই সময় আমি লিখেছিলাম, প্রচার ক'রেছিলাম ফেবিয়ান সোস্যালিজম, এবং ভারতের রাজনীতির লক্ষ্য ও আদর্শ ব'লে তাকে নির্দেশ ক'রেছিলাম। এবং সেই লক্ষ্য

ও আদর্শ নিয়ে ভারতের নানা রাজনীতিক সমস্যার এমন সব সমাজতন্ত্রমূলক সমাধান প্রস্তাব ক'রেছিলাম যাতে কতক লোক হ'য়ে গিয়েছিল ভীত, সন্ত্রস্ত আর বেশীর ভাগ লোকেই আমাকে পাগল ব'লে সংক্ষেপে উড়িয়ে দিয়েছিল। তবু আমার সে সব লেখায় কিছু সাড়া জেগেছিল সে দিন। কিন্তু লোকের চিত্তে তাতে যে মৃদু তরঙ্গটুকু উঠেছিল সেদিন, ধীরে ধীরে সেটা মিলিয়ে গেল, ভুলে গেল সবাই দুদিন বাদেই। আজ দেশে সোস্যালিজম ও কমিউনিজম যে বিরাট তরঙ্গ তুলে সমাজের তটগাত্রে প্রচণ্ড আঘাত ক'রছে, সেদিনের সে মৃদু স্পন্দন-এর অংশ বা উৎস হ'তে পারেনি। আজ অলস ও নিষ্কর্মা হ'য়ে এই চেয়ারে ব'সে ব'সে আমি নবীন সোস্যালিষ্ট ও কমিউনিষ্টদের লেখা পড়ি—অনেক কথা শুনে মন খুসী হয়, মনে হয়, যা হ'ক এতদিনে দেশের পলিটিক্সে কাজের কথার আলোচনা হ'চ্ছে—আবার অনেক কথা শুনে হতাশা আসে, যখন ভাবি কত পল্লবগ্রাহী এদের বিদ্যা ও চিন্তা, কতটা ধারকরা এদের বুলি।

আঘাত করে, বিমূঢ় করে আমাকে বিশেষ ক'রে এই কথাটি যে এই উৎসাহীদের দেশ-হিতৈষণার ভিতরে চরিত্র, সুনীতি, সত্যনিষ্ঠা ও সততার স্থানটা বড় গৌণ। এরা যেটা করবে ব'লে সংকল্প করে সেটা করবার উপায়ের নৈতিক মর্য্যাদার জন্য মাথা ঘামায় না। চুরি, জুয়াচুরি, ডাকাতি, নরহত্যা ও মিথ্যাচার ক'রতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা এদের হয় না। তাছাড়া জীবনের নৈতিক দিকটা এরা বড় তুচ্ছ মনে করে। অনেক নেতা এদের আছে যাদের যৌনজীবন স্মরণ ক'রলে আমার মত কেশব সেনের যুগের মানুষ ঘৃণায় সঙ্কুচিত হ'য়ে ওঠে, কিন্তু তাদের দুর্নীতি ও অনাচার আজ সবাই তুচ্ছ করে। হয়তো এসব আমারই ভুল ; উনবিংশ শতাব্দীর মূল্যমানে বিংশ শতাব্দীর যাচাইটা বোধ হয় অচল। কিন্তু এতে আমার মনে আঘাত লাগে।

কিন্তু এর চেয়ে বেশী যে কথা মনে হয় সেটা আত্মকেন্দ্রিক—আমার নিজের আশা-হতাশার কথা। সব কথাতেই মনে মোচড় দিয়ে ওঠে এই চিন্তা যে এদের বড় বড় কথার অনেক কথাই যে আমি চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে ভেবে-চিন্তে রেখেছি, প্রকাশ ক'রেছি আর কতক খণ্ডন ক'রেছি, আজ কেউ তা জানে

না, মনেও করে না। আর এই অভিজিৎ-সুকুমারের দল এরা তা নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করাটাও সময়ের বাজে খরচ মনে করে।

এরা ভুলে গেছে আমাকে!—যে আমি সজীব ও সক্রিয় ছিলাম পঁচিশ বছর আগেও। আমারও মনে সন্দেহ জাগে। আমি—সে আমি কি সত্যিই আছি? না শুধু ছিলাম। মনে হয় যেন আমি শুধু অতীত ইতিহ একটা বিস্মৃত পরিচ্ছেদ।

২

একলাই ব'সেছিলাম ডুবেছিলাম নিজের চিন্তায়।

আমার চাকর এসে ব'ল্লে, "পাঁচটা টাকা দেবেন? আপনার ওষুধটা ফুরিয়ে গেছে, আনতে হবে।"

আমি বল্লাম, "তা আমার কাছে কেন? দাদাবাবুরা বৌদিদিরা থাকতে আমার কাছে কেন?"

উত্তরে জানতে পারলাম, মেজ ছেলে মেজ বউমাকে নিয়ে ক্লাবে গেছে, তাদের সেখানে পার্টি আছে। ছোট ছেলে সিনেমায় গেছে। ছোট বউমা গেছে ছেলেদের নিয়ে লেকে। ক্রমে খুঁটিয়ে বাড়ীর সবার কথা জিজ্ঞাসা ক'রলাম।

কেউ নেই।

কেউ গেছে ফুটবল ম্যাচ দেখতে, কেউ সভায় গেছে, কেউ কলেজ থেকে ফেরেনি। সুচরিতা আমার বড় মেয়ে, পাটনা থেকে এসেছে মাসখানেক হ'ল। সে গেছে তার মেয়ে নিয়ে তার এক দেওরের বাড়ী।

আমি একা। চাকর-বাকর ছাড়া কেউ নেই। অথচ আমি জানিও না যে কেউ গেছে কোথাও—সুকুমার গেছে, সে কথাও হঠাৎ জেনেছি।

মনটা ভার হ'য়ে গেল। আমি যে এদের কাছে এতটা অনাবশ্যক হ'য়ে গেছি তাতে মনে খোঁচা লাগলো। আমার নিঃসঙ্গতা আরও নিবিড় হ'য়ে আমার মনকে আচ্ছন্ন ক'রলো।

টাকা বের ক'রে দিলাম।

বাইরে ঠক্ ঠক্ ঠক্ লাঠির শব্দ শুনতে পেলাম। এ শব্দ আমার পরিচিত। আসছে সুধাকান্ত, আমার পুরাতন বন্ধু। সেও বৃদ্ধ : যদিও সে আমার চেয়ে প্রায় সাত আট বছরের ছোট। একটু দূরে থাকে সে, তাই সদাসর্বদা আসতে পারে না, কিন্তু সুযোগ পেলেই আসে। দু'এক ঘণ্টা গল্পগুজব ক'রে চ'লে যায়।

সুধাকান্তের সঙ্গে কথায় বার্ত্তায় অনেকটা সময় বেশ কেটে যায়, অনেক পুরাণো স্মৃতি—অতীত গৌরব কাহিনী নিয়ে নাড়াচাড়া ক'রে আমরা আনন্দ পাই। বর্তমান যাদের নেই তাদের এ ছাড়া আর গতি কি?

সে বলে, "মনে পড়ে দাদা, সেই সেবার দার্জিলিঙ্গে। সকাল বেলায় কাটা পাহাড় উঠে হাঁটতে হাঁটতে খেয়াল হ'ল সেঞ্চল যাব।—সে কি লাঞ্ছনা।"

আমি বলি, "মনে নেই? তুমি তো তখন নেহাৎ ছেলেমানুষ। কাটা-পাহাড় থেকে নেমে এসে ঘুমের বাজারে চাল ডাল হাঁড়ি তেল মসলা কিনে নিয়ে হৈ হৈ ক'রে ছুটে গেলাম। তুমি ছুটে গেলে টাইগার হিল, আমি পাহাড়ের উপর ক'খানা পাথর পেতে চড়ালাম খিঁচুড়ী—আর অমনি এলো অবিশ্রাম বৃষ্টি।"

হো হো ক'রে হেসে সে বলে, "নিজে বৃষ্টিতে ভিজে খিঁচুড়ীর উপর ছাতা ধ'রে তাকে আধ-ফোটা ক'রে নামান হ'লো। কিন্তু কি মিষ্টিই লেগেছিল সেদিনকার সেই খিঁচুড়ী।"

"তারপরই সন্ধ্যে হ'য়ে আসে দেখে কি ছুট নীচু পানে! রাত হ'য়ে গেল বাড়ী ফিরতে—ভিজে আমসত্ত্ব হ'য়ে এসে বাড়ীতে সে কী বকুনী খাওয়া। কিন্তু অত ক'রেও অসুখ হ'ল না এক ফোঁটা!

"হাঁঃ, সে একদিন গেছে!" ব'লে সে ব'ল্লে, "আজকালকার এই ফিন্‌ফিনে বাবুরা পারেন তা' ক'রতে? আধ মাইল রাস্তা যেতে হ'লে বাবুরা ট্রাম ব'সে না চেপে পারেন না। পারেন শুধু হৈ হল্লা ক'রতে আর বেলেল্লাপনা করতে।"

বেলেল্লাপনার কথায় উঠলো একজন মস্তবড় নেতার কথা। দেশের লোক

তাঁকে মাথায় করে নাচে। তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্যে লোকে ভিড় ক'রে জমায়েৎ হয়। লোকটা যে পাঁড় মাতাল, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে অর ব্যবহার যে সকল শীলতা বর্জিত একথা লোকে জানে, গ্রাহ্য করে না।

আর একজনের কথা উঠলো যে বন্ধুর বিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে প্রকাশ্যে ঘর ক'রছে তাতে তার নেতাগিরির কোনও ক্ষতি হ'চ্ছে না।

সুধাকান্ত বল্লে, "এরাই আজকালকার ছেলেমেয়েদের আদর্শ! চরিত্র যার নেই সে আবার মানুষ।"

আমার যে শিক্ষা ও সংস্কার তাতে এ বিষয়ে আমি সুধাকান্তের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত। আজকালকার লোকেদের যে সব স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতির কথা শুনি তাতে আমারও মনটা টাটিয়ে ওঠে, দেশের অধোগতির কথা ভেবে। কিন্তু আমি শুধু ব্যথাই পাই, সুধাকান্তের মত তাই নিয়ে বকাবকি করি না।

বর্তমানের কোনও কিছু বা কোনও লোককেই সুধাকান্ত সুচক্ষে দেখতে পারে না। আজ আমাদের যে দশা তাতে আজকালকার প্রাণশক্তিময় তরুণদের সঙ্গে তুলনায় আমরা স্থান পাই না, তাই, আমাদের অতীতের কথা টেনে এনে এদের খাটো ক'রতে চাই, এবং তাতে আমাদের অতীতের তিলটাকে তাল ক'রতে এবং বর্তমানের তালকে তিল ক'রতেও আমাদের অনেকের বাধে না! আমার মনেও মাঝে মাঝে এমন ভাবটা না আসে তা নয়। কিন্তু সুধাকান্তের চেয়ে অনেক বুড়ো হ'লেও তালমান জ্ঞানটা আমার এখনও আছে। একথা বুঝতে পারি আমি যে আমাদের মুখে এসব কথা ছোকরাদের কাছে হবে শুধু হাসির খোরাক। তাই যখন এমন কথা মনে আসে তখন তা' চেপে যাই। সুধাকান্ত তা পারে না।

আজ সুধাকান্তের সুরটা একটু অতিরিক্ত তীব্র। সে এসেই সুরু ক'রলে একালের লোকদের অনেক কিছুর সামর্থ সমালোচনা।

"এই সিনেমা সিনেমা করে লোকগুলো কি ক্ষেপে উঠেছে দেখেছেন দাদা? রাস্তার মোড়ে মোড়ে সিনেমা—আর প্রত্যেকটায় কী ভীড়। কি মধু যে পায়

এতে ওরা, ভগবানই জানেন। সেদিন আমাকে নিয়ে গিয়েছিল টেনে—আ রামঃ। যেমন ছবিটার গল্প, তেমনি গান। অথচ ধন্য ধন্য লেগে গেছে এই ছবিটার।—মায়া—কি বলে—কী ছাই নামটা—মায়া মৃগ—উঁহু—মালা—"

"ছেড়ে দেও ও চেষ্টা ভাই। মনে ক'রতে পারবে না। যে বয়েস হ'য়েছে তাতে নামগুলো মন থেকে পিছলে স'রে যায় : ধরে কার সাধ্যি? নিজের ছেলের নাম মনে থাকে না তা' তোমার বইয়ের নাম। ও চেষ্টা ছাড়।" হেসে বল্লাম আমি।

অন্য দিন হ'লে সুধাকান্তও হাসতো। আর একদিন সেই গল্প ক'রেছিল যে ওর বড় ছেলে একটু দূরে ছিল, তাকে ডাকতে গিয়ে দেখলে যে তার নাম সে সাফ ভুলে গেছে। মনের মাঝে হাতড়ে হাতড়ে সে নাম বের ক'রতে ক'রতে ছেলে চ'লে গেল দৃষ্টির বাইরে, তাকে ডাকা হ'ল না। খুব হেসেছিল সেদিন সে কথা ব'লে।

আজ কিন্তু ও খুব গরম হ'য়েই ব'ল্লে, "নাম একটা ভুল ক'রতে পারি আমরা কিন্তু যাই বলেন, এদের চেয়ে এখনো আমাদের রসবোধটা আছে। এই সব পথের জঞ্জালকে নিয়ে বাহবা দিতে পারি না। এরা যদি দেখতো গিরিশ ঘোষের বা অর্দ্ধেন্দু মুস্তোফির এক্‌টিং বা শুনতো বিনোদিনী কি নরীর গান—তবে মূর্চ্ছা যেতো। হাঁ বই লিখতো গিরিশ ঘোষ। এক একখানা বই এক্ যুগ ধ'রে চ'লতো। তার পাশে এই সিনেমা।"

সুধাকান্তের এ কথায় আমি সায় দিতে পারলাম না। দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য আমার বহুমুখী ব্যর্থ চেষ্টার ভিতর থেকে, আমাদের নাট্যসাহিত্য ও নাট্যকলাও বাদ যায় নি। বিদেশের নাটক ও নাট্যকলা সম্বন্ধে অনেক পড়াশুনা ক'রেছিলাম। এদেশের নাট্যকলা যে তার তুলনায় অনেক পিছনে প'ড়ে আছে, তা আমি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে চেষ্টা ক'রেছিলাম। আমি দেখিয়েছিলাম যে আমাদের নাটকের ষোল আনা ভরসা মেলোড্রামার উপর—সূক্ষ্ম অনুভূতির এতে দারুণ অভাব। আমাদের নাট্যকলা চলে হিষ্টিরিয়ার তালে, শান্ত স্বাভাবিকতার এতে একান্ত অভাব এই ব'লে অনেক সমালোচনা

ক'রেছিলাম সেকালে। আমার আদর্শ অনুযায়ী দু'চারখানা নাটকও লিখেছিলাম ?

কোনও ফল হয়নি। আমার নাটক চলেনি। আমার সমালোচনা কেউ গায়ে মাখেনি। বাঙ্গলা নাটক চ'লেছিল তার নিজের চালে স্রোতের মুখে কুটোর মত, আমাকে সরিয়ে ফেলে।

তাই গিরীশ ঘোষ, অর্দ্ধেন্দু মুস্তাফির নামে সুধাকান্তের এই উচ্ছ্বাসে আমার মন সাড়া দিল না।

তাই আমি ব'ল্লাম, "ওসব তোমার ভুল ভায়া। সেকালের ফ্যাসন বদলে গেছে রুচি বদলে গেছে তাই এদের এসব ভাল লাগে। এ ফ্যাসনও বদলাবে একদিন। কত বদলাই তো দেখলাম আমরা। ভাল মন্দর মানদণ্ড যে রোজই বদলায় ভাই।"

"বদলাবে ঠিক, কিন্তু বদলে আরও খরাপ বই ভালো কিছু হবে না। হয়তো দেখবো দু'দিন বাদে সিনেমা কারো ভালো লাগছে না। এরা চাইবে শুধু প্যারীর মত উলঙ্গ নৃত্য। মরুক গে যাক, কিন্তু এই আজকের হুজুগের ভরসায় তাই ব'লে বুদ্ধিমান লোক লেখাপড়া ছেড়ে ওই সিনেমার নাচে নাচতে যায় ? বলুন তো ?"

"কেন ? কে গেল ?"

"আর বলেন কেন ? ঝাঁক শুদ্ধ ! আমার দুটো নাতি তো আজ দু বছর ধ'রে ওই নিয়ে মেতে আছে। আজ শুনলাম আমার নাতনী কন্‌ট্রাক্ট ক'রে এসে বাড়ীতে নাচতে সুরু ক'রেছে ! কালে কালে হ'ল কি দাদা ? আমার নাতনী —সে কিনা ক'রছে সিনেমা !"

শুনে দুঃখ হ'ল। আমাদের চিরপোষিত আভিজাত্য যে এমনি ক'রে ধুলোয় লুটিয়ে দিচ্ছে সুধাকান্তের নাতনীরা তাতে সত্যি মনে আঘাত পেলাম। পৃথিবীর পরিবর্ত্তনশীল মূল্যমানে যে এমনি ক'রে সব জিনিষের দরদাম ওলট-পালট হ'য়ে গিয়েই থাকে, তা' জানি, কিন্তু তাতে সান্ত্বনা পেলাম না। চুপ ক'রে গেলাম—একটা সান্ত্বনার কথাও ব'লতে পারলাম না।

আমি ব'ল্লাম, "তুমি মানা কর নি?"

বিষণ্নভাবে সুধাকান্ত ব'ল্লে, "মানা ক'রলে শুনছে কে? কেন শুনবে? আমার তোয়াক্কা থোড়াই রাখে তারা! আজ দাদা, ভদ্রলোকের ছেলে এম, এ, পাশ ক'রে পেটভাতা পায় না, আর এই সিনেমায় গিয়ে রাম শ্যাম যদু ছলছলে' টাকা পাচ্ছে। আমার বড় নাতি—বি, এ, পাশ করেনি—সেই এখন পাচ্ছে মাসে হাজার টাকা। তাতেই এদের সবার মাথা ঘুরে গেছে। নাতনী দু'টা শুধু চাঁদপানা মুখের জোরে মাসে দু'শো আড়াই-শো টাকার কন্ট্রাক্ট ক'রে এসেছে। আর আমার কথা শোনবার কিই বা দরকার? আমার মুখের উপর তুড়ি মেরে চ'লে যাবে না?"

বেচারার ক্লিষ্ট মুখ দেখে কাতর হ'য়ে গেলাম। সে শুধু তার দুঃখে নয়। এ দুঃখ যে আমারও। আমার নাতি-নাতনীরা সিনেমায় নামেনি, ছলছলে' টাকাও উপায় ক'রেছে না তারা, কিন্তু তারাও আমার আয়ত্তের বাইরে। বিপদসংকুল পথে তারা অনেকে পা দিয়েছে, আমার বাধার তারা কোনও তোয়াক্কা রাখে না।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর ব'ল্লাম—

"ভুলে যাও ভাই, ভুলে যাও সব। আমরা বুড়োরা হ'চ্ছি বাণের মুখে শুকনো মরা গাছের মত। কালের স্রোতে আমাদের ভাসিয়েই নিতে পারে, আমরা সে স্রোত ঠেকাতে পারবো না। যে ক'দিন আছি, চুপ ক'রে ভেসে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর পথ নেই।"

"কেন থাকবে না? মরণ?"

"তাই বা আসে কই? ঘাটের ধারে ব'সেই তো আছি; খেয়ার মাঝির তো দেখা নেই।"

তারপর কথায় কথায় আজকালকার বাজারের কথা উঠলো। অগ্নিমূল্য জিনিষের কথা হ'ল। আমার কিছু সঙ্গতি আছে তাই চলে যায়, কিন্তু সুধাকান্তের ভরসা তার পেন্সন। পেন্সনের মোটা অংশ কমিউট ক'রে সে একখানা বাড়ী ক'রেছে। এখন যা' পায় তাতে এই মাগ্‌গির বাজারে তার সংসার চলাই দায়।

তাতে আবার আমার শোনা ছিল যে বাড়ী ক'রতে তার ধারও হ'য়েছে কিছু, বাড়ী বাঁধা আছে।

ভেবেছিলাম এই কথায় সুধাকান্তের আর একদফা আক্ষেপ প্রকাশ হবে, কিন্তু তা হ'ল না। বরং সে ব'ল্লে—

"যা দিনকাল প'ড়েছে তাতে আমার মত ছাঁপোষা গৃহস্থের মারা পড়বার কথা। পেন্সনের তো আর মাগ্‌গি ভাতা নেই! ছেলেটা সামান্য চাকরী করে, কিন্তু সস্তায় র‍্যাশন পায়। তাতে কতকটা চলে, আর—

"তোমার বাড়ীর দেনা শোধ হ'য়েছে?

হেসে সুধাকান্ত ব'ল্লে, "হ'য়েছে দাদা! দুখানা ঘর ভাড়া দিয়ে দেড়শো টাকা পাচ্ছি,"—

"দু'খানা ঘর দেড়শো!—তা হ'লে তুমিও ব্ল্যাক মার্কেট চালিয়েছ দেখছি।"

"কি করি দাদা, যা' দিনকাল! এখন আর ভাড়া দেবার ইচ্ছা নেই। আমার নাতিরা তাদের ঐ সিনেমার টাকায় ধারটা শোধ করে দিয়েছে কিনা! কিন্তু আমি না চাইলে কী হবে? কমলী ছোড়তা নেই। ভাড়াটেকে তাড়াবার উপায় নেই—এমনি সব আইন করেছেন বাবুরা!

আমি একটু হেসে ব'ল্লাম, "তবু তো তুমি ঐ নাতিদের সিনেমা করার নিন্দে ক'রছো।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুধাকান্ত ব'ল্লে "নিন্দে! হাঁ তা যা ব'লেছেন। আমার নিন্দে করবার মুখ নেই। ঐ সিনেমার টাকা নিয়ে বেঁচে আছি তাই না বলবার উপায় নেই। কিন্তু কি দুঃখে যে মুখ বুজে আছি তা' আপনি কি বুঝবেন?"

খুব বুঝলাম আমি। সুধাকান্ত এককালে ছিল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তা' থেকে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটও হ'য়েছিল কিছুদিন। তার কাজের খুব প্রশংসা ছিল সেকালে, আর তখনকার দিনে ডেপুটি, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তার মানসম্মান ছিল প্রচুর। লোককে হুকুম করা তার অভ্যাস, আর তার আদেশ সবাই মাথা নত ক'রে মেনে নেবে এইটাই সে সেকালে জানতো। তখন সে

থাকতো খুব চালের উপর। তার পদমর্য্যাদার জৌলুষ আঠার আনা বজায় রাখবার জন্য সে ষ্টাইলের পেছনে খরচ ক'রতো সাধ্যের অতিরিক্ত টাকা। তাই চাকরী ক'রে সে টাকা জমাতে পারেনি। পেন্সন যা' ছিল তার বেশীর ভাগ কমিউট ক'রে নিয়েছিল, ভেবেছিল, যা অবশিষ্ট থাকবে ত'তেই সংসার বেশ চ'লবে। তখন চ'লতোও, আজ চলে না। একটিমাত্র ছেলে, তারও বিশেষ সুবিধা হ'ল না। মাত্র শ' দুই টাকা মাইনায় সে করে একটা মার্চেন্ট অফিসে চাকরী। তারও অনেকগুলি ছেলেপিলে হ'য়েছে। তবু সেই ছেলের পাওয়া সস্তা রেশনের উপর নির্ভর ক'রে তার দিন চালাতে ভরসা ক'রতে হ'চ্ছে দেনা শোধের জন্য। সর্বশক্তিমান প্রভুর পদবী থেকে তার নেমে আসতে হ'য়েছে এদের উপর নির্ভরশীল অক্ষমতার ভূমিতে। তার হাকিমি মেজাজ সব সময়ে নিজেকে তার এই অবস্থার সঙ্গে মিশ খাইয়ে নিতে পারে না। তার মতামত নিয়ে ছেলে নাতিদের স্বাধীনতা খর্ব করবার ব্যর্থ চেষ্টায় সে পায় আঘাত, বেদনা।

শুধু এই কথাই নয়। অন্নবস্ত্রের অভাব তার নেই, ছেলে নাতি-নাতনীর রোজগারে তার সংসার স্বচ্ছল-ভাবেই চ'লছে। কিন্তু, চিরদিন যে দিয়েই এসেছে, ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনীদের সব, দরকারের জন্য যার কাছে তারা হাত পেতে শুধু নিয়েইছে, তাকে আজ—হোক না, ছেলের কাছে, নাতির কাছে, —হাত পেতে নিতে হ'চ্ছে এটা তার ঠিক বরদাস্ত হচ্ছে না। যে দিয়েই এসেছে চিরদিন তাকে দেবার সম্বল হারিয়ে যদি সুধু নিতেই হয় তবে যতই স্নেহের সে দান হোক তাতে গ্রহীতা হারিয়ে ফেলে তার মর্য্যাদা। এই মর্য্যাদাহানির যে বাক্যহীন বেদনা তা বোঝে কয়জন? তা'ছাড়া ডেপুটী বাবুর নাতি-নাতনীরা সিনেমার পরদায় নেচে পয়সা রোজগার ক'রবে এতে সে যে কি অপমান বোধ ক'রছে তা বুঝলাম। শুধু অশক্তির দায়ে, ভব্যতা রক্ষার খাতিরে, এই অপমান তাকে হজম ক'রতে হ'চ্ছে। এ ব্যথা যে কি ব্যথা তা হৃতগৌরব গতযৌবন অক্ষম বৃদ্ধ ছাড়া কে বুঝবে?

সুধাকান্ত আজ তার দুঃখের পশরা উজাড় ক'রে দিতে এসেছে যেন।

এর পর সে ব'ল্লে তার আর এক নাতনীর কথা। সে সিনেমার অভিনেত্রী নয়, লেখাপড়ায় ভাল, বি, এ, পাশ ক'রেছে।

"পাশ ক'রে তিনি ধিঙ্গী হ'য়েছেন," ব'ল্লে সুধাকান্ত, "দিনরাত কোথায় যে সে টো টো ক'রে বেড়ায় কেউ জানে না। তার বাতিক মীটিং করা, প্রোসেশন করা। তিনি নাকি কমিউনিষ্ট হ'য়েছেন। বিয়ে ক'রবেন না। কেবল হৈ হৈ ক'রে বেড়ান, আজ ষ্ট্রাইক, কাল হরতাল, পরশু আর কিছু এই নিয়ে ব্যস্ত আছেন। বলবো কি দাদা লজ্জার কথা, ও সব শুধু ভড়ং, শুধু ওই উপলক্ষে রাজ্যের অমনি সব ভবঘুরে ছেলেদের সঙ্গে ইয়ারকী করাই তার আসল কাজ। তার কাণ্ডকারখানা দেখলে মাথা কাটা যায়। যদি বলি কিছু মেয়ে অমনি মারমূর্তি হ'য়ে ওঠে।"

আমি কিছু বল্লাম না, গম্ভীর হ'য়ে রইলাম। এই বিষ যে আমারও বুকের তলা পুড়িয়ে খাক ক'রছে দিনরাত। সুকুমার, অভিজিৎ অমন খাসা খাসা ছেলে, এই কমিউনিজমের বন্যায় তারাও ভেসে প'ড়েছে, শেষে কোন চড়ায় আছড়ে প'ড়বে কে জানে? সুকুমারের চরিত্র সব দিক দিয়েই দৃঢ় ও নির্মল। ও যে নৈতিক কোনও অপরাধ ক'রবে এ শঙ্কা আমার বেশী ছিল না। তবু ঐ যে কয়েকটি মেয়েকে হামেশাই ওর কাছে আসতে আর ওর সঙ্গে মেশামেশি ক'রতে দেখি সেটাও ভাল লাগে না। ওদের ভয় হয়।

তারপর সে জিজ্ঞাসা ক'রলে "দাদা আছেন কেমন?"

"খাসা আছি", বল্লাম আমি, "এই পায়ের ব্যথাটায় ক'দিন যা কিছু কাবু হ'য়ে র'য়েছি, নইলে আর কোনও অসুখই নেই—আমাকে নেবার যমের দেখছি কোনও তাড়াই নেই।"

"সেটা যমরাজের সুবিবেচনার পরিচয়। দুঃখের বিষয় এমনি বিবেচনা তা'র প্রায় দেখা যায় না।" ব'ল্লে সুধাকান্ত।

সুবিবেচনা! না আমার উপর গায়ের ঝাল ঝাড়া?

যমরাজকে গ্রাহ্য করি নি কোনও দিনই। সুস্থ সবল দেহে তাজা প্রাণে চিরদিনই আমি মৃত্যুকে তুড়ি মেরে দৃঢ়পদক্ষেপে চ'লেছি জীবনের পথে—

আজ সে তার শোধ তুলছে। দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে চালিয়ে দিয়েছে সে তার অদৃশ্য অঙ্গুলি। গ্রাস করবার কোনও তাড়াই নেই। ছোট ছেলেরা এক টুকরা পরম প্রিয় খাদ্য পেলে যেমন তাকে গিলে ফেলবার চেষ্টা না ক'রে বিন্দু বিন্দু স্বাদ নিয়ে তাকে উপভোগ করে, অনেকটা তেমনি। অলক্ষিত গতিতে শরীরের নানা অঙ্গ শিথিল, শক্তিহীন হ'য়ে যাচ্ছে, ছোট ছোট ব্যথা, বিন্দু বিন্দু অশক্তি মাথা চাড়া দিয়ে মনকে তিক্ত ক'রছে কিন্তু সম্পূর্ণ ক্ষয়ের কোনও এদের তাড়া নেই। মৃত্যুর এ খেলা যেন বেড়ালের নেংটে ইঁদুর নিয়ে খেলা।—দীর্ঘজীবন ভ'রে মৃত্যুকে যে তুচ্ছ ক'রেছি এ যেন তার একটা মর্মান্তিক প্রতিশোধ!

ব'ল্লাম সে কথা সুধাকান্তকে—হেসে ব'ল্লাম, প্রচুর রস দিয়ে। সুধাকান্ত উপভোগ ক'রলে সে রস।

সে ব'ল্লে, "অদ্ভুত মানুষ আপনি দাদা, কোনও দিন দেখলাম না কোনও কষ্ট গায় মাখতে। হেসেই সব উড়িয়ে দেন। আমি যদি তাই পারতাম!"

ব'লে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে উঠে গেল।

মিছে কথা বলেনি সুধাকান্ত। হাসি আমার চিরদিনের সঙ্গী, রহস্য আমার রোগের মত। ভারী ভারী বিপদ নিয়েও রহস্য ক'রতে আমার বাধে না। মনের গভীরতম ব্যথা আবরণ ক'রে আমি জীবনে কত না রহস্য ক'রেছি।

মৃত্যু শয্যায় যখন আমার স্ত্রী শুয়ে, প্রতিমুহূর্তে বিপদের শঙ্কায় চিত্ত ব্যথিত, তখনও আমি তাঁর সব ভয় ভাবনা, সকল বেদনা লঘু ক'রে দিতে পেরেছি রহস্য ক'রে। তাই তিনি, ব'লতে গেলে হাসিমুখেই শেষ বিদায় নিতে পেরেছিলেন।

কিন্তু হাসি বা হাসাই যখন, তখন মনের তলায় অনেক সময় যে তপ্ত ফল্গু টগবগ ক'রে ফুটতে ফুটতে ব'য়ে যায় তার খবর কে জানে?

(৩)

সুধাকান্ত ব'সে থাকতেই আমার মেয়ে সুচরিতা তিনবার উঁকি মেরে গেছে। দেখতে পেলাম প্রত্যেক বারই তার কপালটা যেন বেশী কুঞ্চিত হ'চ্ছে, মুখখানা বেশী অন্ধকার হ'চ্ছে। তার সময়ের হিসাব খুব কড়া, তাই হিসাব ক'রে যথাসময়েই সে দেওরের বাড়ী থেকে ফিরে এসেছে।

সুচরিতা ছেলেমানুষ নয়। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। তার একটা বৃহৎ সংসার আছে পাটনায়। তা' ফেলে সে কিছুদিনের জন্য এসেছে এখানে —দু'দিন আমার দেখাশোনা ক'রতে।

তাই তার দেখাশোনার উৎসাহটা বাড়ীর আর সবার চেয়ে' অনেক বেশী। আমাকে যথাসময়ে খাওয়ানো শোয়ানো, ওষুধ দেওয়া শুশ্রূষা করা ছাড়া তার অন্য চিন্তা নেই। স্পষ্ট দেখতে পাই তার মনের ভিতর একটা অল্প প্রচ্ছন্ন অভিযোগ আছে বাড়ীর সবার উপর, তারা আমাকে যথেষ্ট সেবা করে না ব'লে। তাই সে কোমর বেঁধে লেগে গেছে আমার সেবায় আজ এক মাস হ'ল। তাড়নায় আমাকে প্রায় অস্থির ক'রে তুলেছে। নজরবন্দী আসামীর উপর পুলিসের সাবধান খরদৃষ্টি আমার উপর সুচরিতার পাহারাদারীর চেয়ে অনেক কমজোর।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম। সুচরিতার অভ্রান্ত হিসাবে যখন আমার খাওয়া উচিত তারপর পোনেরো মিনিট অতিক্রান্ত হ'য়ে গেছে। সেই সময়ের হিসাব ক'রে সে বাড়ী ফিরেছে। আমাকে খাইয়ে তারপর আধঘন্টা ধ'রে আমার পায়ে মালিস ও সেক দিতে হবে, তারপর একটা ওষুধ খাইয়ে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিতে হবে। তার এই প্রোগ্রামে সুধাকান্ত ব্যতিক্রম উপস্থিত করায় সে ক্রমাগতই অপ্রসন্ন হ'য়ে উঠছে।

মিছে কথা ব'লবো না, সুচরিতার এই সেবানিষ্ঠায় আমার ভারী তৃপ্তি হয়। মনে হয় তার মার কথা। আজ দশ বৎসর তিনি চ'লে গেছেন। তাঁর মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর ছিল ঠিক এমনি আগ্রহ ও নিষ্ঠা আমাকে সেবা

করবার। তখন আমার সেবার কোনও প্রয়োজনই ছিল না, দেহ ছিল আদ্যো-পান্ত শক্ত, মনে কোনও অশক্তিই ছিল না। তবু এই সম্পূর্ণ সুস্থ আত্মপ্রতিষ্ঠ স্বামীটির অটুট জীবনের ফাঁকে ফাঁকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সেবার অবসর তিনি খোঁজ ক'রে নিতেন আর ফাঁক পেলেই একটু সেবা ক'রে কৃতার্থ হ'তেন। অনেক দিন তিনি নিজে অশক্ত হ'য়ে প'ড়ে ছিলেন, তাঁকেই সেবা ক'রতে হ'য়েছে আমার দিনরাত,—তাতে তাঁর কুণ্ঠার অবধি ছিল না। কিন্তু তারই ভিতর শুয়ে শুয়ে তিনি যেখানে সেবার অবসর খুঁজে পেতেন, চাকর-বাকর ছেলেমেয়ে, নাতিনাতনীদের দিয়ে সেটুকু করিয়ে ছাড়তেন। তিনি যাবার পর এরা তাদের পাহারাদারী থেকে ছুটি পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে।

এ দশ বৎসর তেমন নিষ্ঠা ও সেবা আমি পাইনি, তার অভাবও অনুভব করিনি। কেননা যদিও মাঝে মাঝে বাতে আমায় কাবু করে তবু এখনও আমি মোটের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠ—যেটুকু সেবা না হ'লে চলে না আমার, সেটুকু আমি চেয়েই নিতে পারি। বাড়ীর সবাই, যারা বারো মাস আমার কাছে থাকে তাদের কোনও দিন এটা অনুভব করবারই অবসর হয় না যে এর বেশী কিছু দরকার হ'তে পারে —আমারও হয় না।

কিন্তু সুচরিতা এসেছে দু'দিন হ'ল। সে মনে করে যে বাড়ীর লোক আমাকে যথেষ্ট যত্ন করে না। ঠিক তার মায়ের মত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে আমার সেবার লক্ষ অবসর খুঁজে বের করে এবং বাড়ীর সবার সে বিষয়ে দৃষ্টির অভাবে ক্ষুণ্ণ হ'য়ে সে উঠে প'ড়ে লেগে থাকে সে ত্রুটি সংশোধন ক'রতে। অনেক দিনের বিস্মৃত আর একটি সেবার স্মৃতি মনে জেগে উঠে এতে বেশ একটু তৃপ্তি দেয় আমায়।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে বিদ্রোহ। আমি যে নিজে লাফিয়ে বেড়াতে পারি না, হাঁটতে গেলে সময় সময় আমাকে ধ'রে নিতে আসে এরা বা সিঁড়িতে ওঠা-নামা করতে প্রায় কোলে ক'রে নিতে চায়—আমার সেবা যে ক'রতে হয় কারো এই কথাটাই মনের মধ্যে বিষম খোঁচা দেয়।

বুড়ো হ'য়েছি সে তো আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। তাই ব'লে,

একটু মাথা ধ'রলে, একটু পেট ব্যথা হ'লে যে দু'চার জোড়া ব্যগ্র চক্ষু আমাকে করুণ নয়নে দেখতে আসবে, ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে খোঁজ নেবে আমি কেমন আছি, তাতে মনের ভিতর মোচড় দিয়ে ওঠে বিদ্রোহ। বলবার মুখ নেই সে কথা, কেন না, এর ভিতর দুএকবার এই সব ছোটখাট আরম্ভ থেকেই আমার পলিত শরীর এমন একটা তোলপাড় ক'রে তুলেছে যে সবার ব্যস্ত হবার যথেষ্ট কারণই হ'য়েছে। তবু—

তিনবার ঘুরে গিয়ে শেষে চতুর্থ বারে সুচরিতা তার ছোট মেয়ের সঙ্গে ঘরের ভিতর ঢুকে সুধাকান্তকে ব'ল্লে "কাকাবাবু, বাবার খাবার সময় হ'য়েছে!"

নিতান্ত অপ্রস্তুত হ'য়ে সুধাকান্ত উঠে বল্লে, "তাইতো, কথায় কথায় অনেক দেরী হ'য়ে গেছে—উঠি আমি এখন।"

সে চ'লে গেল,—স্পষ্ট বুঝতে পারলাম বেশ অপ্রসন্ন হ'য়েই গেল।

তারপর সুচরিতা আমাকে তুলে নিতে এলো। সে আর তার চোদ্দ বছরের মেয়ে সঞ্চরিতা চায় দুই হাত ধরে আমায় টেনে তুলতে। আমি তাদের সে চেষ্টা এড়িয়ে নিজেই উঠে পড়'লাম। এতখানি পঙ্গু তো আমি হইনি! পায়ে ব্যথাটা চিড়্ চিড়্ ক'রে উঠলো, দাঁত চেপে সে কষ্ট অগ্রাহ্য ক'রে লাঠি ভর ক'রে ঠুক ঠুক ক'রে চ'ল্লাম। তবু এরা ছাড়ে না। তারা দুজনে দুদিক থেকে এসে আমায় আলগোছে ধ'রে রইলো। ভারী বিরক্ত লাগলো, কিন্তু আর বাধা দিলাম না।

খাওয়ার পর তারা আমায় নিয়ে গেল শোবার ঘরে। তারাই নিয়ে গেল। সম্পূর্ণ অনাবশ্যক সাহায্য ক'রে তারা আমায় হাঁটিয়ে নিলে যেমন ক'রে ছোট ছেলেকে হাঁটি হাঁটি পা' পা' ক'রে মায়েরা হাঁটতে শেখায়।

তারপর চললো মালিস।

যতক্ষণ সুচরিতা মালিস ক'রছে ততক্ষণ তার মেয়ে সঞ্চরিতা, ঘরের চারদিক ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলো।

কতকগুলো ফোটো ছিল, তার মধ্যে একটা ছিল হকি খেলোয়াড়দের। খুব অস্পষ্ট হ'য়ে গেছে সে ছবি—অনেক দিন আগের তোলা।

সঞ্চরিতা ব'ল্লে, "এ কাদের ছবি দাদ্মণি।"

আমি হেসে ব'ল্লাম "বল্‌তো?"

অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে সে ব'ল্লে, "একজন বোধ হয় বড়দাদা—যে মাঝখানে ব'সে আছে। তাই না?"—বড়দাদা মানে সুকুমার।

আমি ব'ল্লাম, "না বড়দাদা নয়, ও আমি। কলেজ হকি টীমের ক্যাপ্টেন।"

চোখটা এমন বড় বড় ক'রে অবাক হ'য়ে সে চাইলে আমার দিকে যেন সে একটা অসম্ভব কাহিনী শুনছে। তারপর ব'ল্লে, "ধ্যেৎ তুমি আবার হকি খেলতে পার নাকি?"

"পারি না, কিন্তু শুধু হকি কেন, অনেক কিছুই পারতাম। ঐ ক্যাবিনেটটা খুলে দেখ্‌।"

ক্যাবিনেট খোলা হ'ল, তার ভিতর ছিল সোণা-রুপার সব মেডাল, আর কয়েকটা কাপ। ইউনিভার্সিটি থেকে যে মেডালগুলো পেয়েছিলাম সেগুলো একে একে প'ড়ে গেল সে নিঃশব্দে। তারপরই ছিল একটা কাপ, হাই-জাম্পের প্রথম পুরস্কার ইস্কুলে পড়বার সময় পাওয়া।

"তুমি হাই-জাম্প ক'রতে পার দাদুমণি?" বলে সে একেবারে হেসে গড়িয়ে পড়লো; তারপর ব'ল্লে, "একটু লাফাও না, দেখি।"

হেসেই আমি ব'ল্লাম, "পারি না, পারতাম।"

সঞ্চরিতার হাসিতে আমোদ হ'ল আমার, কিন্তু মনের ভিতর একটু খোঁচাও দিলে।

আমার বিয়ের পর থেকে এই সব বিদ্যালয়ের ও খেলার মাঠের পুরস্কার গুলি দেখে দেখে আমার স্ত্রীর চোখ গর্বে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতো, তিনিই পরে যত্ন ক'রে এগুলি একটা সুদৃশ্য ক্যাবিনেটে সাজিয়ে রেখেছিলেন। যতদিন বেঁচেছিলেন প্রায়ই এগুলি মেজে-ঘ'সে ঝক্‌ঝকে ক'রে রাখতেন, বুড়ো বয়সেও।

সঞ্চরিতার এগুলি দেখে পেলো শুধু হাসি। এই বুড়োকে হাই-জাম্প কি হকি খেলার নায়ক-ভাবে কল্পনা ক'রতেই তার হাসি পেলো। তার হাসি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলে যে এগুলি যার গৌরবের নিদর্শন ব'লে আমি

যত্ন ক'রে সাজিয়ে রেখেছি, কোথায় সে? সে ছিল একদিন, এখন সে তো নেই! তার নামের মুখোস প'রে এই বুড়ো আজ শুধু ব্যঙ্গ-নৃত্য ক'রছে! ওই ফোটোর মতোই আমি নিজেও যে পুঁছে গেছি। ভারি অশ্রদ্ধা হ'ল নিজের উপর।

সঞ্চরিতার হাসি থামলো না। এর পর সে একটা একটা ক'রে বাকী পুরস্কারগুলো দেখতে লাগলো। এক একটা দেখে আর নতুন ক'রে হাসিতে গড়িয়ে পড়ে। খোঁচা খোঁচা কথা ব'লে ঠাট্টা করে আমাকে।

সুচরিতা তাকে ধমক দিয়ে থামাবার চেষ্টা ক'রলে। কিন্তু প্রবল ফোয়ারার মুখে হাত দিয়ে কি তার প্রবাহ থামান যায়? পরিণত কৈশোরের টলমল উচ্ছল কৌতুকে তার অন্তর ভরপুর, তার হাসি কি থামে মায়ের একটা ছোট্ট তিরস্কারে।

আমি তার কথায় না হেসে পারলাম না। তাকে বেশ রসাল করে গোটাকয়েক জবাব দিয়ে জব্দ ক'রবার চেষ্টাও ক'রলাম। কিন্তু মনের তলায় তলায় ব'য়ে গেল একটা ক্লিষ্ট বেদনা।—মনে হ'ল, সঞ্চরিতা মিথ্যে বলেনি—আজ আমার কীই বা অ'ছে? আমার অতীতের এই সব গৌরব বহন ক'রে আমি যেন চোরাই মালের ভাণ্ডারী হ'য়ে ব'সে আছি, বিশ্বজগতের হাসির পাত্র হ'য়ে।

(৪)

রাত দশটায় ফটকের কাছে একটু গোলমাল শুনতে পেলাম।

সুচরিতা আমাকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা ক'রছিল, সে বিরক্ত হ'য়ে উঠে গেল গোলমাল থামাবার জন্যে। শুনলাম সিঁড়ির মাথা থেকে, সে ডেকে বলছে। "কী গোলমাল ক'রছো তোমরা, বাবাকে ঘুমোতে দেবে না।"

গোলমাল থামলো না, সুচরিতাও ফিরে এলো না, সেই বরং নেমে গেল নীচে।

অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা ক'রে শেষে উঠে পড়লাম। বিছানা থেকে উঠে—লাঠি নিয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে এগিয়ে চ'ল্লাম।

সিঁড়ির মাথায় গিয়ে শুনতে পেলাম সুচরিতা একটু নীচু গলায় বলছে ; "যাও, তোমরা ওকে শুইয়ে দিয়ে চুপ ক'রে থাক। বাবার কানে কথা তুলে দরকার নেই।"

আমি ডেকে বল্লাম, "কী হ'য়েছে সুচরিতা?"

সুচরিতা তড়্ বড়্ করে উপরে উঠে এসে আমাকে বল্লে, "এ কি, আপনি উঠে এয়েছেন? শোবেন চলুন।" "শোব পরে, কী হ'য়েছে আগে শুনি।"

"কিছু নয়, মীটিংএ গিয়ে সুকুমার মারামারি ক'রে এসেছে। একটু চোট লেগেছে।"

বাধা মানতে পারলাম না। ঠক্ ঠক্ ক'রে লাঠি ভর ক'রে চ'লে গেলাম নীচে। সুচরিতা আমাকে বক্‌তে বক্‌তে চললো আমার একখানা হাত ধ'রে। আমাকে বকলে সে, আর প্রাণ ভ'রে গাল দিতে লাগলো সুকুমারকে। এই বুড়ো মানুষটিকে কষ্ট দিতে এক ফোঁটা দ্বিধা নেই তার, একবার ভাবেও না সে আমার কথা। কি এক দস্যি দানব যে এসেছে ঘরে, সবাইকে খেয়ে তবে যাবে! বাড়ীর অন্য লোকও বাদ যায় না, কেউ কিছু ক'রবে তো নাইই, দু'দণ্ড যে শান্তিতে ঘুমোবো আমি তাও দেবে না ইত্যাদি।

সুকুমারকে দেখে স্তব্ধ হ'য়ে গেলাম। একটু চোট নয়, ম'নে হ'ল বিষম আঘাত পেয়েছে সে। গায় একাধিক ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। যন্ত্রণায় তার মুখ বিকৃত।

জিগেগ্‌স কর'লাম, কী হয়েছে। সে বেশী কথা বলতে পারলে না, ব'ল্লে শুধু, পুলিশের গুলিতে সে আহত হ'য়েছে—মারাত্মক আঘাত হয় নি কিছু।

অভিজিৎ এক কোণায় দাঁড়িয়ে ছিল, তার কাছে মোটামুটি কথাটা শুনলাম। সভা ভাঙ্গবার জন্যে গিয়েছিল এরা। একজন বক্তা ব'লতে উঠতেই চারদিক থেকে হট্টগোল তুলে দিলে সুকুমার অভিজিতের দল। মারামারি লেগে গেল। যারা বক্তৃতা মঞ্চে ছিল তারা পালিয়ে গেল, দু'এক ঘা খেয়ে। তখন সুকুমার মঞ্চের উপর উঠে বক্তৃতা ক'রবার উদ্যোগ ক'রলে।

ততক্ষণ পুলিশ এসে প'ড়েছে। কাঁদুনে বোমা ছাড়লে তারা, সবাই ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পালাতে লাগলো। একদল পুলিস রিভলভার নিয়ে মঞ্চের উপর উঠতে গেল—একটা ধাক্কা খেয়ে তারা রিভলভারের গুলি ছুঁড়তে লাগলো। সেই গুলিতেই সুকুমার আহত হ'য়েছে।

আঘাত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুকুমার লাফিয়ে নীচে নামে। সেখান থেকে তাকে সবাই তোল্লা ক'রে সরিয়ে ফেলে নিয়ে গেল একজন চেনা ডাক্তারের বাড়ী। সেখানে শুশ্রূষার পর তাকে নিয়ে এসেছে এখানে।

গুলি লেগেছে বটে কিন্তু আঘাতটা মারাত্মক নয়। যন্ত্রণায় সে থেকে থেকে ছট্‌ফট্‌ ক'রছে, কিন্তু চ্যাঁচাচ্ছে না। দাঁতে দাঁতে চেপে সে বিকৃত মুখে যন্ত্রণা সহ্য ক'রছে।

আমি একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে শুধু নিরর্থক ছোটাছুটি ক'রতে লাগলাম।

সুচরিতা এসে আমার হাত ধ'রে টেনে ব'ল্লে, "আপনি শুতে যান বাবা, আমরাই ওকে দেখছি। কিছু তো হয় নি ওর!"

কিছুই হয় নি! যাতনা বিকৃত মুখে ওই যে বেচারা বীরের মত দুঃসহ ব্যথা হজম ক'রছে কিছুই নয় ওটা!

সুকুমার আমার বড় নাতি, আশৈশব পিতৃহীন। ওর জন্ম থেকে আমরা স্বামী স্ত্রী দুজনে ওকে বুকের ভিতর পুরে সমস্ত সত্তা দিয়ে ভালবেসেছিলাম। একটু ব্যথা পেলে, সামান্য অসুখ ক'রলে ভয়ে ম'রেছি, ওর নিজের চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট পেয়েছি। আজ সুকুমার বড় হ'য়েছে : নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়ে সে আমার কোনও মনোযোগের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আমার বুক যে আজও ওর বিন্দুমাত্র ব্যথায় টাটিয়া ওঠে তা কে বুঝবে? সেই সুকুমার আজ গুলি খেয়ে ব্যথায় ছট্‌ফট্‌ ক'রছে—তবু কিছু হয় নি!

এই কথাটায় হঠাৎ আমার চোখ ছাপিয়ে জল বেরিয়ে গেল। আমি ব'ল্লাম, "কিছুই হয় নি? বলিস কী? কী যে হ'য়েছে তা' তোরা বুঝবি না!"

সুচরিতা একটু স্নিগ্ধ স্বরে ব'ল্লে, "আমি তা' বলছি না। মানে ভয়ানক কিছু হয় নি। আমরা তো আছি, আপনি যান শোন গে, আমি ওর কাছে থাকছি! আপনি এখন না শুলে শরীর খারাপ হবে।"

অভিজিতও ব'ল্লে, "হাঁ দাদু, আপনি যান। আমরা যা করবার হয় করবো। আপনি ব্যস্ত হবেন না।"

এ সব ব্যাপারের গুরুত্ব, এর দর দাম সম্বন্ধে আমার সঙ্গে এখন এদের একমত হবার সম্ভাবনা নেই। আমারও একদিন ছিল যখন এমনি সব ছোটখাট যন্ত্রণা আমি এমনি তুচ্ছ ক'রতে পারতাম। হকি খেলতে গিয়ে একবার আমার মাথা ফেটে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছিলাম। তারপর অনেকদিন মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে প'ড়ে থাকতে হয়েছিল। আমার বাবা তখন মহাব্যস্ত হ'য়ে প'ড়ে থাকতেন আমার বিছানার পাশে ; মনে হ'ত কি বৃথা ব্যস্ত হ'চ্ছেন! কীই বা হ'য়েছে, দু'দিন বাদে সেরে যাবে।

এদের কথা শুনে আমার মনে হ'ল, আমার সে মন গেল কোথায়?

শুতেই গেলাম। মুরগী যেমন তার ছোট ছোট ছানাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে চলে, তেমনি ক'রে পাহারা দিয়ে আমাকে নিয়ে গেল সুচরিতা।

আমাকে শুইয়ে দিয়ে সুচরিতা তার মনের ঝাল ঝেড়ে দিলে সুকুমারের উপর। "হতভাগা ছেলে! একবার ভেবে দেখে না বুড়ো ঠাকুর্দার কথা। কেবল নিজের খেয়াল নিয়ে আছেন। তাতে এই বুড়ো মানুষ যে ভেবে ম'রছে, একটাবার ভাবে সে কথা? আরও কী যে সর্বনাশ ক'রবে কে জানে। আপনাকে না মেরে ফেলে কি ও বাঁদর ছাড়বে। লক্ষ্মীছাড়া অলপ্পেয়ে কোথাকার! দেশ উদ্ধার ক'রবেন!—ঘোড়ার ডিম ক'রবেন। নিজের বাপ ঠাকুর্দার উপর যার দরদ নেই তিনি ক'রবেন দেশের দশজনকে উদ্ধার"—

এমনি ব'কতে ব'কতে সে সঞ্চারিতাকে বসিয়ে রেখে চ'লে গেল।

যুক্তির দিক দিয়ে সুচরিতার কথা অগ্রাহ্য, কিন্তু কথাগুলো আমার বড় ভাল লাগলো। মুখে বলি না আমি, কিন্তু এমন দিন নেই যেদিন এমনি কথা আমার মনে না হয়। মনে হয় আমার পরিবারের কেউ যেন আমার

কথা যথেষ্ট ভাবে না, আমার সুখ দুঃখের হিসাব করে কাজ করে না। তাদের স্বাধীন ইচ্ছায় 'যে যা' ক'রতে চায় তাতে আমার বুকে যে ব্যথা লাগতে পারে তার হিসাব করে না। বুড়ো বয়সটা বোধ হয় বড় স্বার্থপরতার বয়স—এ সময়ে মানুষ হ'য়ে যায় অতিরিক্ত আত্মকেন্দ্রিক, সব জিনিষের ভাল লাগা মন্দ লাগার বিচার করে সুধু নিজের সুখ দুঃখের পরিমাপে। তাই আমার এ সম্বন্ধে যা' অভিযোগ তা মনেই চেপে রাখি। আজ মেয়ের মুখে সেই কথার প্রতিধ্বনি শুনে তবু বেশ একটু তৃপ্তি বোধ ক'রলাম।

(৫)

শুয়ে—ঘুমুলাম না। ভাবতে লগলাম।

মনের পরদায় অভ্যাস মত খেলে গেলো আমার অতীতের বিচিত্র ছবি।

আমার যৌবনের কথা মনে হ'ল। মনে এই আকাঙ্ক্ষা তখন আমার সমস্ত জীবন আচ্ছন্ন ক'রে ছিল যে আমি ঠিক আমার দেশের দশজনের মত বে'চে থাকবো না, এমন ভাবে বাঁচবো যাতে পৃথিবীর জীবনের উপর আমার অস্তিত্বের একটা স্থায়ী ছাপ থেকে যায়। এমন একটা দান দিয়ে যাব যার ফলে সারা বিশ্ব প্রগতির একটা খুব বড় ধাপ পার হ'য়ে যাবে। ছোট খাট কৃতিত্ব, ছোটখাট খ্যাতি, যা' আমাদের দেশের অল্প বিস্তর অনেকের লাভ হ'য়েছে সে সব আমার চোখে ছিল তুচ্ছ। আমার কর্মের মূল্য ও খ্যাতি হবে সেক্‌সপীয়ারের মত, নিউটনের মত, ডারউইনের মত। জগতের চিন্তাধারাকে আমি উল্টে ফেলে একেবারে নিখুঁত সত্যের মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দেবো।

এই প্রকাণ্ড উচ্চাকাঙ্ক্ষার আনুষঙ্গিক, কিন্তু কতকটা গৌণভাবে ভাবতাম আমার দেশের উন্নতির কথা। দেশকে আমি নিজের চেষ্টায় একেবারে গৌরবের চরমশিখরে উঠিয়ে দেবো। দেশবাসীকে শোনাব এমন বার্তা যাতে মুগ্ধ হ'য়ে তারা আমার নেতৃত্বে একটা প্রকাণ্ড বড় কাজে অগ্রসর হবে। শুধু

ইংরাজের রাজত্ব বিলোপ সে কাজের একটা অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ অঙ্গ, সে কাজে স্বাধীন ভারত হ'য়ে দাঁড়াবে জ্ঞানে কর্মে সম্পদে জগতের শীর্ষস্থানীয়।

এই আকাঙ্ক্ষায় কত যে কাজ ক'রেছি সারা জীবনভোর সে সব কথা সারবন্দী হ'য়ে মনে এলো। সাময়িক সফলতা না পেয়েছি তা' নয়, যশের একটা মৃদু গুঞ্জন হয় তো মাঝে মাঝে কাণে এসেছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোনও কিছুই হয়নি। পদে পদে নিষ্ফলতা আমাকে বিদ্রূপ ক'রে গেছে। যশের মন্দিরের যে মণিকোঠায় প্রবেশ ক'রতে চেয়েছিলাম সে বরাবরই র'য়ে গেছে দূরে অতি দূরে! মন্দিরের দেউড়ীর দ্বার রয়েছে রুদ্ধ। হয়তো আমার সে শক্তি ছিল না, কিম্বা ছিল না ভাগ্য। কিন্তু এইটাই আমার জীবনে চিরদিন নিয়মিতভাবে হ'য়ে এসেছে। কাজে কখনো বিরাম হয়নি। ছটফটানির অন্ত ছিল না কোনও দিন, কিন্তু ফল, কোনও দিনই ফললো না। চেষ্টার তাতে শ্রান্তি হয়নি। পদে পদে নিষ্ফল হ'য়েও নূতন উৎসাহে ছুটে চ'লেছি নূতন কাজে। গাজনের সন্ন্যাসীর মত কোথাও যদি ঢাক বেজেছে, অমনি নেচে উঠেছি। কাজের মত কাজ করবার সুযোগের সন্ধানে মন প্রাণ সর্বদা সজাগ হ'য়ে থাকতো, কোথাও কোনও সন্ধান পেলেই সহস্র নিষ্ফলতার বোঝা ঝেড়ে ফেলে লেগে যেতাম নূতন চেষ্টায়। মরূদ্যানের মত আমার স্বপ্ন আমাকে টেনে নিতো ; দুর্দ্ধর্ষ প্রতিজ্ঞা নিয়ে ছুটে চলতাম চিরদিন।

ছুটেই চ'লতাম, পে'ছিতাম না কোথাও। লক্ষ্যস্থানের কাছে এসে দেখতাম সে জায়গা হয় ভেঙ্গে গেছে, না হয় দখল ক'রে ব'সে আছে অন্য লোকে।

তাই, জীবনে হ'ল যা সেটাকে বেশী ক'রে চাইনি কোনো দিন। হ'ল উপার্জ্জন, হ'ল বংশবৃদ্ধি। আমার ছেলে মেয়ের দিকে চেয়ে লোকে ব'লতো, চাঁদের মত ছেলে মেয়ে। মিথ্যে ব'লতো না। আমার উপার্জ্জন খুব বেশী নাহোক, তাই দেখে অনেকের চোখ টাটাতো। কিন্তু কোনও দিনই এসবে আমার মন ভ'রতো না। জীবনে যা' বেশী ক'রে চেয়েছিলাম সে স্বপ্ন স্বপ্নই র'য়ে গেল—জীবন হ'য়ে রইল নিষ্ফলতার বোঝা।

আগে এতে রাগ হ'ত আমার জগতের লোকের উপর। পৃথিবী আমাকে

আমার যোগ্য সম্মান দিচ্ছে না, এ বোধটা ছিল তখন প্রবল, তাই রাগ হ'ত। এখন নিজের ওজন অনেকটা বুঝেছি দুনিয়ার মাপকাঠিরও মাত্রা বুঝেছি। তাই এখন আর রাগ হয় না।

কিন্তু এই কথা নিয়ে বিশ্বের স্রষ্টা ও নিয়ন্তার কাছে একটা অভিযোগ আমার চিরদিনই আছে ও থাকবে। শেষে সুধু এই নিষ্ফলতার ধোঁয়া আর জ্বালা ছাড়া কিছুই যদি অবশিষ্ট না থাকবে, তবে কী প্রয়োজন ছিল আমার প্রাণে অতখানি আগুন জ্বালাবার?

শেষে একদিন দীনতার সহিত অনুভব ক'রতে হ'ল—আর শক্তি নেই, ফুরিয়ে গেছি আমি। তখন আমি সত্তর পেরিয়ে গেছি। তখন অবশেষে জানতে পারলাম আমাকে দিয়ে বড় কিছু হবার নয়। এও বুঝলাম যে এতদিন যা কিছু নিয়ে ছট্‌ফট্‌ করেছি সে সব ভুল, যে আদর্শটাকে আঁকড়ে ধ'রে যখন চ'লেছি, তার দোষত্রুটি এখন চোখে প'ড়লো।

ভুল যে করেছি সেটা জীবনেও পদে পদে অনুভব ক'রেছি কিন্তু তাতে দমি নি কোনও দিন—সত্তর পেরোবার আগে। এখন বুঝলাম যে সব চেয়ে বড় ভুল আমার হ'য়েছে নিজের শক্তির পরিমাণ বোধে। যতখানি শক্তি আমার আছে ভাবতাম, আমার তা' ছিল না। যত বড় নিজেকে মনে করতাম তার চেয়ে অনেক ছোট আমি। তাই বহুক্ষেত্রে আমি হেরে গেছি তাদের কাছে যাদের আমি অবজ্ঞা ক'রেছিলাম।

সত্তর পেরিয়ে অতীতের দিকে চেয়ে মনে হ'ল আর কিছু করবার নেই। জীবনের ঘোড়দৌড়ে আমি হেরে গেছি। তাতে হতাশ হ'লাম, কিন্তু তার চেয়ে বেশী হতাশ হলাম, দুনিয়ার দিকে চেয়ে। আমার দীর্ঘজীবনের পথে অনেকবারই দেখেছি দুনিয়ার সব জিনিষের দরদামই উল্টো পাল্টা হ'য়ে গেছে। যখন যে পরিবর্তন হ'য়েছে তখনই আপনাকে সেই নূতন দরদামের হিসাব ক'রে মানিয়ে নেবার চেষ্টা ক'রেছি। আমার মনটা স্থিতিশীল ছিল না মোটে। তাই নূতন আদর্শ নূতন মূল্যমান নিজের জীবনে মানিয়ে নিতে কোনও কষ্টই হয় নি। কিন্তু শেষে পেঁৗছে সমস্ত জীবনের হিসেব নিকেশ

ক'রতে গিয়ে দেখলাম যে যে ভূমির উপর সারাজীবন আমি দাঁড়িয়েছিলাম সেইটাই গেছে স'রে।

আমার কৈশোর ও যৌবনে বিদ্যার মর্য্যদা ছিল সবচেয়ে বেশী। তাই পণ্ডিত হবার জন্য ব্যাকুলতা ছিল আমাদের। তারপর দেখলাম শুধু পাণ্ডিত্যের সে মূল্য নেই, যে বিদ্যা নগদ ফল দিতে পারে সেইটাই বড়। ফিলসফি ভেসে গেল, তার জায়গায় এলো ইকনমিক্স। সেই বিদ্যাই অর্জ্জনের চেষ্টা ক'রলাম। ক্রমে সেই ইকনমিক্সের ভিত্তিটাই গেল উল্টে। ভেসে চ'ল্লাম সোস্যালিজমের বন্যায়। তারপর দাঁড়াল রাশিয়ার বলশেভিজম্। সেটাকেও আত্মস্থ ক'রে নিলাম—কিন্তু শেষে দেখতে পেলাম যে আমার সমস্ত জীবনটা যে সব খুঁটিতে বাঁধা ছিল একে একে সে সব যায় উপড়ে। হাল ছেড়ে দিলাব।

যৌবনে আমাদের ছিল একটা প্রকাণ্ড নৈতিক আদর্শ। চরিত্র হবে নির্ম্মল, ত্যাগ হবে গরীয়ান, সেবায় জীবন হবে উজ্জ্বল, এই যে আদর্শ নিয়ে জীবন আরম্ভ করেছিলাম, জগতের সে আদর্শ গেল কোথায়? জীবনের মূল্যমান বদল হ'তে হ'তে দাঁড়াল এই যে চরিত্রের নির্ম্মলতা গুণ যদি হয় তবে সে একটা তুচ্ছ গুণ, সততা সত্যনিষ্ঠা এ সবের মূল্য আপেক্ষিক। সফলতাটাই একমাত্র মানদণ্ড। যার কাজের শক্তি আছে আর কাজ ক'রে যে সে ধর্ম, নীতি দুই পায় দলিত ক'রে উঠতে পারে গৌরবের চরম শিখরে —সেই জীবনই হ'য়ে উঠেছে আদর্শ জীবন।

টলষ্টয় তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে প্রচার ক'রেছিলেন যে, প্রেম ও সেবাই জীবনের প্রধান ধর্ম, তাতেই মানুষ বেঁচে থাকে, বৃদ্ধি পায়। সেকালের ব্যবহারিক জগৎ সে নীতি মানেনি, কিন্তু আমরা সেজন্য জগৎকে ঘৃণাই ক'রতাম, আশা ক'রতাম একদিন জগতের এই মোহ ভেঙ্গে দিয়ে মানুষ এই পরস্পর দ্বেষ, হিংসা ও দ্বন্দ্বের জীবন উত্তীর্ণ হ'য়ে পৌঁছুবে প্রেম ও পারস্পারিক সেবার আদর্শে। ভিক্টোরিয়ান যুগের শেষভাগে আর এডোয়ার্ডের যুগে এই আদর্শে লোকের আস্থা খুব বেড়ে গিয়েছিল, এবং সবাই আশা ক'রেছিল যে, বুঝি চিরশান্তির যুগ আসন্ন।

সে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল, নীট্‌শে প্রচার করলেন যে নূতন নীতি, সব দেশেই অল্পবিস্তর তার অনুগামী দেখা দিল। মার্কস ও এঙ্গেলস গ্রহণ ক'রলেন বিরোধহীন শান্তিকে চরম আদর্শ ব'লে, কিন্তু ইতিহাসের বিশ্লেষণ ক'রে তাঁরা দেখালেন যে এ আদর্শের দিকে অগ্রসর হবার একমাত্র উপায় রেভোল্যুশন—সংঘর্ষ। শক্তিবাদ এর থেকে একটা বিরুদ্ধ শক্তি পেল। তারপর লেগে গেল প্রথম মহাযুদ্ধ, তারপর একটা স্থিত হবার আগেই এলো বলশেভিজম, এলো ফাশিজম—এলো মুসোলিনী হিটলার। চট্‌পট্‌ জীবনের আদর্শের মান ঘুরে গেল। সারা বিশ্বে এই মতটাই হ'য়ে উঠলো যে শক্তি সংগ্রহ ও প্রয়োগই যে কোনও কাম্যবস্তু, যে কোনও আদর্শলাভের একমাত্র উপায়। দেশে দেশে শ্রেণীতে শ্রেণীতে লেগে গেল শক্তির লড়াই। ব্যক্তিগত জীবনে নিরীহ, শান্তিকামী, সেবাপরায়ণ যে, সে হ'য়ে রইলো কোণঠাসা, এগিয়ে গেল সেই যার লড়বার শক্তি আছে, আর সে শক্তির প্রয়োগে আর কোনও কুণ্ঠা নেই।

বার্ধক্যে পৌঁছে দেখলাম যে সারা বিশ্বে, আর আমাদের দেশেও এই আদর্শই অপরিসীম ব্যাপ্তি লাভ ক'রেছে। ডিমোক্রেসীই হোক, শ্রেণীহীন সমাজই হোক, সত্যনিষ্ঠ ও সেবামূলক আদর্শ মানবই হোক, দূর আদর্শ হিসাবে মৌখিক পূজা তাকে সবাই দেয়, কিন্তু প্রকৃত পূজার প্রতীক তাদের শক্তি—নির্মম, দুর্ধর্ষ শক্তি। অহিংসাবাদের নাম ক'রে তাই গান্ধীবাদী যাঁরা তাঁরাও ক'রে গেলেন শক্তির পরীক্ষা—হিংসার সাধনা।

বুঝতে পারলাম এ আদর্শের জগতে আমার মত অতীত যুগের মানুষের স্থান নেই—আমি বাতিল। মিউজিয়মে রাখবার মত একটা বস্তু হ'তে পারি, যার দিক তাকিয়ে লোকে ধারণা ক'রবে অতীত যুগের মানব কেমন ছিল, কতকটা স্পর্ধা, কতকটা কৃপার সহিত ব'লবে—এইটি সেই ভিক্টোরিয়ান যুগের একটা নিদর্শন, কেবল কল্পনার রাজ্যে বাস ক'রে, আজকের ব্যবহারিক জীবনে misfit—বেমানান, অচল।

আমার মনে এ অভিমান এখনো আছে যে, এরা যা বোঝে তার চেয়ে বেশী

বুঝি আমি আজও। সেই বুদ্ধিতে আমার মনে হয় যে, আজ যাদের হাতে দেশের মঙ্গলামঙ্গলের ভার তারা অনেক স্থলেই চলেছে ভুল পথে—তাদের সে ভুল বুঝিয়ে দিতে পারি আমি। কিন্তু কী লাভ তাতে? আমার কথা শুনবে কে? আজকের জগতে আমি যে বাতিল।

এ জ্ঞান এসেছে আজ, তাই হাত-পা গুটিয়ে ব'সে আছি। যখন হয়নি এ জ্ঞান তখন কোনও দিন মনে হয়নি যে, যে আলো আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে আমাকে টেনে নিচ্ছে সেটা আলেয়া। তাই উৎসাহের কখনো অভাব হয়নি আমার, চেষ্টায় শ্রান্তি আসেনি কখনও—সত্তর পেরোবার আগে।

মনে হ'ল, সুকুমার আমার সেই অতীত যৌবনের ছবি। ওর চোখেও লেগেছে একটা আলেয়ার আলো। তাই প্রাণপণ ক'রে ছুটে চ'লেছে ও আগে পাছে না চেয়ে, সর্বত্যাগী নিষ্ঠা নিয়ে। ভাবতে বুকটা ভেঙ্গে গেল তার অবশ্যম্ভাবী হতাশা ও শাস্তির কথা ভেবে। আমি আজ বুঝতে পারছি ওর ভ্রান্তি, কিন্তু ওর বয়সে যখন আমি নানা বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছি তখন আমারও মনে হয়নি বিপদের কথা। সুবুদ্ধির কথা কেউ বলতে এলে চটে গেছি, তার সঙ্গে তর্ক ক'রেছি, তাকে উপহাস করেছি। কারও কথা শুনে কোনও দিন সংকল্পিত পথ ছাড়িনি।

সুকুমারও ছাড়বে না নিশ্চয়।

তাতে কী হবে? ভাগ্যের চাকা কি তার বেলায় ঘুরে যাবে, এবং আমার মত হতাশ না হ'য়ে সে কি পাবে পরিপূর্ণ সফলতা, যেমন আজকের কংগ্রেসের নেতারা পেয়েছেন সহস্র গঞ্জনার পর? না কি ও তলিয়ে যাবে দুর্ভাগ্যের আবর্তে। আমার বিবেচনায় যতদূর বুঝি তাতে মনে হয় ফল শুভ হ'তে পারে না। নিষ্ফল জীবন তার শতসহস্র ব্যথা যন্ত্রণার পথে গিয়ে পাবে শুধু পরিপূর্ণ হতাশা! হয় তো ওর জীবন পথে চ'লতে চলতে এমনি জীবনের, আদর্শ সব মূল্যমান ওলট পালট হ'য়ে যাবে ও দেখতে পাবে যে ওর আদর্শের স্বপ্ন নিয়ে এ বিশাল জগতে ও দাঁড়িয়ে আছে একা!

ভাবতে বুকটা ভেঙ্গে গেল।

অনেকের মতে এ দোষ আমার। আমারও মনে হ'ল এখন হয় তো তাই। সুকুমারের প্রতি আমার কর্তব্য আমি সাধ্যমত করেছি—আমার সে যত্নে সুফল ফলেছে—সে মানুষ হ'য়েছে। কিন্তু আমার স্নেহ তার কাছে যা চায় তা দিতে সে কোনও যত্ন করেনি।

তার কারণ কি এই যে, আমি তাকে আদেশ ক'রে দৃঢ়তার সহিত সে আদেশ পালন ক'রতে বাধ্য করিনি?

হয় তো তাই। শুধু সুকুমার কেন, সারা জগতের কাছে আমি যা চেয়েছি তা যে পাইনি সে হয়তো আমার দুর্বলতার জন্য। আমি শুধু মনে মনেই আকাংক্ষা ক'রেছি, হাত পেতেই ব'সে থেকেছি, জোর ক'রে দাবী করিনি কিছুই। তাই ব্যস্ত বিশ্ববাসী আমার আকাংক্ষার কোনও সমাদরই করেনি। আমি আমার নিজের জন্য চাইনি কিছু, চেয়েছি এদেরই উপকারের জন্য—তা যে পাইনি তাতে আমার হয়েছে সামান্য ক্ষতি, বেশী ক্ষতি হ'য়েছে এদের সবার তা' আজ বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। জোর যার মুলুক তার এ কথাটা হাড়ে হাড়ে বুঝেছি, কিন্তু এখন তা' বুঝে কোনও ফল নেই। জোর ক'রবার দিন আমার ফুরিয়ে গেছে।

বড় দুঃখ হ'ল সুকুমারের জন্য। সে যদি অপদার্থ হ'ত, তবে তার দুঃখে দুঃখ পেলেও বুঝতাম এসব পাপের ফল। কিন্তু সুকুমার তীক্ষ্ণধী, সচ্চরিত্র, আদর্শপ্রাণ—তার ভিতর মূর্তিমান হ'য়ে উঠেছে আমার সেই অতীতের আদর্শ। নিজের বুদ্ধি, চরিত্র ও কর্মকুশলতার বলে সে তার বয়সী যুবকদের সহজ নেতৃত্ব গ্রহণ করতে পারে। তার মত পৌত্র থাকা গৌরবেরই বিষয়। তাই তার অবশ্যম্ভাবী দুঃখময় পরিণতির কল্পনায় বুকটা যেন ভেঙ্গে গেল।

মনে হ'ল, সেই পরিণতিটাও কি আমার চেয়ে দেখতে হবে?

চিরজীবন আমি নিঃশেষে কর্তব্যনিষ্ঠ বলে দর্প অনুভব ক'রেছি। আজ মনে হ'ল জীবনের শেষের বড় কর্তব্যে আমার ত্রুটি হ'য়ে গেছে। জীবন যখন ফুরিয়ে যায় তখন মৃত্যুই মানুষের একমাত্র কর্তব্য, সে কর্তব্য পালনে

আমার বড় দেরী হয়েছে। তাই আমার সুকুমারের এই দুঃখও কি দেখে যেতে হবে?

সকাল বেলায় ঘুম ভাঙ্গতেই নীচে নেমে গেলাম। রাত্রে ঘুম ভাল হয় নি, তাই উঠতে একটু বেলা হ'য়েছিল। নীচে সুকুমারের ঘরে গিয়ে দেখলাম—সে সেখানে নেই।—খুঁজে দেখলাম কোথাও সে নেই।

বুকটা ভয়ানক কেঁপে উঠলো। কাল রাত্রে তাকে যে অবস্থায় দেখেছি তাতে তার আজই নিজে নিজে উঠে যেতে পারবার কথা নয়।

তবে কি—? ভাবতে সর্বাঙ্গ হিম হ'য়ে গেল। ভয়ে একটা চাকরকে জিজ্ঞেস করলাম, সে ব'ল্লে রাত্রে তারা সবাই ঘুমিয়েছিল, তারপর কখন যে সুকুমার চ'লে গেছে তা' তারা কেউ জানে না। অবাক কান্ড! বিভ্রান্ত হ'য়ে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে সুধু চেয়ে রইলাম।

সুচরিতা সঞ্চরিতা, এদের কথা জিজ্ঞেস ক'রলাম। শুনলাম সুচরিতা খুব ভোরে উঠে চ'লে গেছে। আমি ঘুমিয়ে ছিলাম ব'লে আমার ঘুম ভাঙ্গায়নি। ব'লে গেছে পাটনা থেকে জরুরী খবর এসেছে তাই যেতে হ'ল, আমি যেন ব্যস্ত না হই।

অবশেষে তেতলা থেকে আমার ছোট ছেলে ও ছোট বউমা ঘুম ভেঙ্গে উঠে এলো। ছেলে ব'ল্লে, সুকুমারকে গভীর রাত্রে অভিজিৎ সরিয়ে নিয়ে গেছে—আজ নাকি ভয়ানক ধর-পাকড় হ'বে তাই ওরা গা'ঢাকা দিয়েছে।

পরে আমার টেবিলের উপর চাপা দেওয়া একখানা চিঠি নজরে প'ড়লো। লিখেছে সুচরিতা।

সে লিখেছে,

"বাবা, আমার আজ ভোরে ভোরেই যেতে হ'ল। বিশেষ জরুরী দরকার। কোনও ভাবনার কারণ নেই। সুকুমার ভালই আছে এবং নিরাপদ আছে। তার জন্য কোনও চিন্তা ক'রবেন না।"

সুকুমারকে কোথায় নিয়ে গেল অভিজিৎ? সে আহত, অসুস্থ, যন্ত্রণায় কাতর, তবু তাকে নিয়ে গেল। কেন? ধরপাকড়ের ভয়! প্রাণের ভয়ের চেয়েও কি সেটা বেশী। গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হ'লে কত যে কষ্ট হ'তে পারে কত বিপদ, হয়তো মৃত্যুর সঙ্গে ধস্তাধস্তি ক'রতে হবে! সে সব কল্পনা ক'রতেও বুক ব্যথিত হ'য়ে উঠলো।

দু'দিন ছট্‌ফট্‌ ক'রলাম। প'ড়ে প'ড়ে ভাবলাম কত কি ছাইভস্ম।

যখন স্থির হ'লাম তখন ভাবলাম, কাজ কি আমার ভেবে? আমার ভাবনায় তো কারও কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না। দেহ আমার এখনও জীবিত, কিন্তু এদের চক্ষে তো আমি আর এখন নেই।

এরা কেউ আমার কথার অপেক্ষা তো আর রাখে না। নিজেরা বড় হ'য়েছে, তাই নিজেরা যা ভাল বোঝে তাই ক'রবে। তাই ক'রেছে চিরদিনই সবাই যখন যে যুবক থেকেছে। বুড়োদের সেবা করা যায়, যত্ন আত্তি করা যায় কিন্তু তাদের কথা শুনে নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা তো খাটো করা যায় না! বুড়ো বিষ্ণুশর্মার কথার অর্ধেকটা এরা মানে, "সর্বত্রৈবং বিচারে তু ভোজনেহপ্যপ্রবর্ত্তণম্‌" কিন্তু 'আপৎকালে উপস্থিতে'ও যে বুড়োর কথার মূল্য আছে সে কথা এরা একটা প্রাচীন কুসংস্কার ব'লে মনে করে।

নইলে সুকুমারের এই বিপদেও এরা কজন মিলেই সব ব্যবস্থা স্থির ক'রে ফেললো—আমার কাছে রইলো সব গোপন। কেন না আমার পরামর্শের কোনও মূল্য তো নেই। আমি যে অতীত!

দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো আমার, তবু অনেকটা সুস্থির হ'লাম।

(৭)

অভিজিতের সংবাদ ভুল হয়নি। পরের দিন সকালে কাগজ খুলেই দেখতে পেলাম কমিউনিষ্ট পার্টির বহুলোক গ্রেপ্তার হ'য়ে গেছে, জোর খানাতল্লাসী চলেছে।

আশ্চর্য হ'লাম এই ভেবে যে, তারা সুকুমারের খোঁজে আমার বাড়ীতে এলো না। পুলিসের চোখের সামনে সুকুমার আহত হ'য়ে প'ড়ে গেল, তারা তাকে ধরতে পারলে না, তার কোনও সন্ধানও নিলে না! গুপ্ত পুলিসের অনেক বাহাদুরীর গল্প শোনবার অবসর হ'য়েছে আমার, সেই পুলিসের এক অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ পদধারীর মুখে। কিন্তু অন্যের কাছে এও শুনেছি যে, তাদের নাকের ডগা দিয়ে বিপ্লবী ঘুরে বেড়িয়েছে তবু তারা তার সন্ধান ক'রতে পারেনি। কমিউনিষ্টদের নেতস্থানীয়ের মধ্যে একজন সুকুমার। তাকে নজরবন্দীও রাখেনি তারা। আর এখনও তার সন্ধানে তারা আমার বাড়ীতে আসেনি। তারা কি জানে না যে, সুকুমার আমার নাতি ও আমার বাড়ীতেই থাকে? এমনটা হওয়া যে অসম্ভব নয় তার একাধিক দৃষ্টান্ত আমি দেখেছি। কলকাতার বেশ একটু নামজাদা একটি লোকের ছেলে বিলেত থেকে ফেরবার পরই লণ্ডন পুলিশ কলকাতায় তার সন্ধান করবার জন্য খবর পাঠিয়েছিল। তার পাসপোর্টও পুলিস লণ্ডনে পরীক্ষা ক'রেছিল, অথচ চারমাস তারা সেই হারাণ লোকটিকে খুঁজে পেলো না। সে তখন বাপের বাড়ীতেই প্রকাশ্যভাবে খাতিরজমা হ'য়ে বাস ক'রছে। চারমাস পরে সে ছেলে বিলেতে ফিরে গেল, তখন পুলিস তার ঠিকানা আবিষ্কার ক'রে সন্ধান ক'রতে এসে দেখলো যে তার শিকার ফেরার। সুকুমার সম্বন্ধেও তাঁরা বোধ হয় সেই রকম কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন! এতে আশা হ'ল যে, সুকুমার যেখানেই থাকুক সে হয়তো পুলিসের হাত এড়িয়ে থাকতে পারবে।

আমার অনুমান যে ঠিক সম্পূর্ণ সত্য নয় সেটা আবিষ্কার ক'রলাম সেইদিন দ্বিপ্রহর রাত্রে। সদর দরজায় ঘন্টা বেজে উঠতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম পুলিসের লোক। বাড়ী ঘেরাও ক'রে তারা সদর দরজায় হানা দিয়েছে।

দোর খুলতেই গুপ্ত পুলিসের একজন উচ্চ কর্মচারী স্থানীয় থানার ইন্‌স্পেক্টার, একটি সশস্ত্র কনেষ্টবল ও দুইজন পানবিড়িওয়ালা শ্রেণীর লোক ভিতের এসে আমার সঙ্গে দেখা ক'রতে চাইলেন।

আমার বাড়ীতে পুলিস ঘেরাও ক'রে তদন্ত ক'রবে এটা ছিল আমার স্বপ্নের অতীত। বিশ বৎসর পূর্বেও কোনও পুলিস আমার বাড়ী খানাতল্লাসীর কথা ভাবতেও পারতো না। তখন ছিলাম আমি একজন মহাপদস্থ ব্যক্তি—সবাই আমাকে সমীহ ক'রতো। তাছাড়া আমার জীবন ও কর্মে গোপনতার কোনও সংস্রবই ছিল না। অনেক লড়াই ঝগড়া ক'রেছি আমি ; কিন্তু আমি কোনও গোপন কাজ ক'রে আইন লঙ্ঘন ক'রবো একথা কেউ কখনও কল্পনাও ক'রতো না। রাজকর্মচারীদের তীব্র সমালোচনা আমি প্রায় করতাম কিন্তু তবু বড় বড় রাজকর্মচারী আমাকে শ্রদ্ধা ক'রতেন। যে কোনও অধস্তন কর্মচারী আমাকে ঘাঁটাতে এলে ওপরওয়ালার কাছে ধমক খাবার ভয় ছিল, তার পরিচয় একাধিক বার পেয়েছি।

তাই পুলিস আমার বাড়ী খানাতল্লাসী ক'রতে এসেছে এই সংবাদে আমি খেলাম একটা প্রচণ্ড ধাক্কা। আমার আত্মমর্য্যাদায় লাগলো আঘাত। কিন্তু একটু ভাবতেই মনে হ'ল, আসবার হেতু তো ঘটেছে—না আসবে কেন ? তবু প্রাচীন মর্য্যাদার সংস্কারে আঘাত লাগায় একটু পীড়া বোধ ক'রলাম। সঙ্গে সঙ্গে এ কথা ভেবে হাসি পেলো যে, শিকার পালাবার পর পুলিসের এই বিশাল আয়োজন—সময় থাকতে গত রাত্রে তো আসেনি এরা।

আমি এসে ব'সলাম। ইন্‌স্পেক্টার আমাকে সার্চসওয়ারেন্ট দেখালেন, বল্লেন, তাঁরা দু'জন সাক্ষী নিয়ে এসেছেন।

সাক্ষীদের দিকে চেয়ে হেসে আমি ব'ল্লাম, "আপনাদের বাছাই করা এই দুটি মহামান্যবর পানওয়ালা ও বিড়িওয়ালা সাক্ষী আমি গ্রাহ্য ক'রবো মনে ক'রলেন কেন ?"

ইন্‌স্পেক্টার ব'ল্লেন, "এত রাত্রে সাক্ষী পাওয়া যাবে না ব'লে এদের এনেছি। তা' আপনি ইচ্ছে করেন তো অন্য সাক্ষী আনতে পারেন।"

তাদের বসিয়ে রেখে পাশের বাড়ী থেকে দু'জন ভদ্রলোককে ডেকে আনালাম। খানাতল্লাসী আরম্ভ হ'ল।

আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "কার জন্যে ক'রছেন এ অনুসন্ধান ?"

"সুকুমারবাবুর জন্যে।"

"সে তো এখানে নেই।"

"সে আমরা জানি! মীটিং থেকেই তিনি চ'লে গেছেন সে খবর আমরা জানি। তখনই আমাদের লোক চ'লে গেছে তাঁর সন্ধানে।"

চমকে উঠলাম আমি, কিন্তু পরক্ষণেই আশ্বস্ত হ'লাম। মীটিং থেকেই সে চ'লে গেছে এই এদের ধারণা। স্পষ্ট বুঝলাম, কেউ এদের ভুল খবর দিয়ে বিভ্রান্ত ক'রেছে। আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "কোথায় গেছে সে?"

হেসে কর্মচারিটি ব'ল্লেন, "সে খবরটা আপনার কাছেই জানতে আশা করি।"

আমার এই জীর্ণ জ্যোতিহীন চোখ দুটোও যেন এ কথায় জ্বলে উঠলো। আমি ব'ল্লাম, শুনে সুখী হ'লাম। কিন্তু, দেখতে পাচ্ছি আপনারা আমার চেয়ে বেশী জানেন।"

খানাতল্লাসী হ'তে হ'তে ভোর হ'য়ে গেল। বলাবাহুল্য কোনও কিছুই এমন পাওয়া গেল না যা' পুলিসের কোনও কাজে আসতে পারে। কিন্তু একেবারে খালি হাতে যেতে হয় দেখে তাঁরা সুকুমারের নাম লেখা দু'খানা খাতা নিয়ে গেলেন। সুকুমার যখন কলেজে পড়ে তখন এই খাতা লিখতো সে। এতে কতকগুলো অঙ্ক কষা আছে তা এঁদের বুদ্ধির অগম্য বলেই এঁরা সে-দুটো নিয়ে গেলেন।

সুকুমার কোথায় গেছে বা আছে তার সম্বন্ধে এঁরা আমার চেয়ে বেশী অজ্ঞ তা' বুঝলাম। পরে জানতে পেরেছি যে, সুকুমারের দলের একটি ছোকরাই পুলিসের কাছে ভুল খবর দিয়েছে যে সে কটক গেছে। এমনি ক'রে তাদের বিভ্রান্ত করবার জন্যেই সে গুপ্ত পুলিসের কর্মচারাদের সঙ্গে প্রচুর ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করে।

—এও ছিল কপালে! আমার বাড়ীতে হ'ল পুলিসের খানাতল্লাসী! পুলিসের নেকনজরে পড়া যে একটা মহা বাহাদুরী ও সম্মানের কথা, তাদের চোখে ধুলো দিয়ে পালান যে একটা উঁচু রকমের tactic এ ধারণা এ যুগের। যে যুগে আমার জীবনের বেশীর ভাগ কেটেছে তখন ধারণাটা ছিল সম্পূর্ণ

উল্টো। অবশ্য আমার যৌবনের কতকটা অংশে আমিও একেবারে পুলিসকে অগ্রাহ্য ক'রে শক্ত শক্ত কথা বলতে কসুর করি নি, এবং তার জন্য যদি জেলে যেতে হয় তাতেও প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু তার ভিতর কোনও গোপনতা ছিল না। যা' কিছু করেছি প্রকাশ্যেই করেছি লুকোচুরী ক'রতে ঘৃণাবোধ ক'রেছি। সেইজন্য পুলিস আমার গোপন অপরাধ ধ'রে ফেলবার আশায় কোনও দিন খানাতল্লাসী করবার দরকার বোধ করেনি। তাই আমার বাড়ীতে পুলিসের এই হানায় আমার আত্মসম্মানকে দিলে একটা প্রকাণ্ড আঘাত।

বিশ বছর আগেও আমার ছিল একটা এত বড় প্রকাণ্ড সম্মান, লাট দরবারে আমার ছিল এমন একটা বিশাল প্রতিপত্তি যে, আমার বাড়ীতে সন্দেহ থাকলেও পুলিশ এসে হানা দিতে সঙ্কোচ করতো। একবার আমার লেখার তীব্রতায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে পুলিস আমার বিরুদ্ধে একটা কিছু করবার চেষ্টা ক'রেছিল। আমি জানতাম যে, স্বয়ং গভর্ণরের আদেশে সে চেষ্টা অঙ্কুরে বিনষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল। আজ আমার সে সম্মান, সে প্রতিষ্ঠা নেই, তাই পুলিসের ইন্‌স্পেক্টার এসে অসঙ্কোচে তচ্‌নচ্‌ ক'রে বাড়ীতে খানাতল্লাসী ক'রলে, আর আমাকে কিছুমাত্র সমীহ করা দূরের কথা, এমন ইঙ্গিতও দু'একটা ক'রলে যেন আমি স্বয়ং অপরাধী যদি নাও হই, তবু আমি জেনেশুনে অনেক কিছু গোপন ক'রে যাচ্ছি। ইন্‌স্পেক্টারের এসব ইঙ্গিত আমার গায়ে যেন বিষের ছুরীর মত আঘাত করছিল। কিন্তু কিছু বলবার মুখ নেই আমার—সুকুমার তো এই বাড়ীতেই ছিল।

তবু মনের ভিতর যে ক্রোধ অবিরত গর্জন ক'রছিল সেটা আমি সম্পূর্ণ গোপন ক'রতে পারলাম না। এদের কাজ শেষ হয়ে গেলে ঝাঁঝের সঙ্গে ব'ল্লাম, "হ'লে তো আপনার কাজ! পেলেন খুব দামী হদিস! কেমন? দেখুন একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে দেবার পর লোককে নাজেহাল করাটাই মস্ত বাহাদুরী মনে করবেন না। হাঙ্গামা নিবারণ করাটাই আপনাদের কাজ এটা মনে রাখলে আপনারা বেশী কাজ করতে পারবেন।"

ইন্‌স্পেক্টার একটু অবজ্ঞার সঙ্গে উত্তর করলেন, "আমি পোনেরো বৎসর পুলিশের কাজ করছি ; আপনার উপদেশের অপেক্ষায় বসে নেই।"

আমার রাগ আরও চ'ড়ে গেল, ব'ল্লাম, "সেই পোনেরো বৎসরের বিদেশী শাসনের শিক্ষাই আপনাদের কাল হ'য়েছে। প'চিশ বছর আগে আমি কিছুদিন বাঙ্গালাদেশের কাউন্সিলের মেম্বার ছিলাম। তখন ইংরেজ সরকারের পুলিশ শাসনের যে নীতি ছিল আপনারা আর আপনাদের কর্ত্তারা সেই নীতির শিক্ষাই পেয়েছেন, শাসনের আর একটা যে পদ্ধতি আছে যাতে লোককে এর চেয়ে সহজে আজ্ঞাধীন করা যায় সে খবর আপনারা জানেন না, আপনাদের কর্ত্তারাও জানেন না।"

তাকে জানাতে বাধ্য হ'লাম যে প'চিশ বৎসর আগে ইংরেজ আমলে কিছুদিন আমি শাসন পরিষদের সভ্য ছিলাম। তখন গভর্ণমেন্টের দমননীতি সমর্থন ক'রতে পারিনি ব'লে পদত্যাগ ক'রেছিলাম। তখন যদি গভর্ণমেন্ট আমার উপদেশ গ্রহণ ক'রতেন তবে দেশের এ দুর্গতি হ'ত না!

ইন্‌স্পেক্টার হেসে উঠলো। ব্যঙ্গ ক'রে ব'ল্লে, "তাই তো, আপনার উপদেশ না মেনে এত বড় সর্বনাশ হ'য়ে গেল! দেশটা স্বাধীন হ'য়ে গেল!"

ক্রোধে ঘৃণায় অন্তর ভ'রে গেল। আর কথা কইতে পারলাম না।

রাগটা যখন সম্পূর্ণ প'ড়ে এলো তখন মনে হ'ল, আমারই ভুল হ'য়েছে। প'চিশ বছর আগে লোকে আমার কথা মানুক না মানুক তাকে শ্রদ্ধা ক'রতো! তাই ব'লে আজকের এই অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধের কথা লোকে শুনবে কেন? সে দুনিয়া যে নেই, আর সে আমিও তো নেই। তখন আমার শক্তি ছিল, অশ্রদ্ধার শক্ত প্রতিবাদ করবার, শক্তি ছিল লোককে কথা শোনাবার, কেন না তখন কথাকে কাজ দিয়ে পরিপূর্ণ করবার শক্তি ছিল, আমার। আজ সে শক্তি নেই। আজ আমি মিউজিয়ামে রাখা মমির মত টিকে আছি শুধু লোকের কৌতূহলের তৃপ্তি দিতে।

(৮)

আমার বাড়ীতে খানাতল্লাসীর খবর বেরিয়ে যেতে হঠাৎ অনেক বন্ধু সমাগম হ'ল। সবাই এলেন কৌতূহলী হ'য়ে—ব্যাপার কি জানবার ব্যগ্রতায় আমার চেয়ে অনেক ছোট হ'লেও এ'রা সকলেই বৃদ্ধ—আমারই মত সবাই কর্ম্মময় জীবন থেকে অপসৃত হ'য়ে ব'সে আছেন।

আমি বেশীর ভাগ সময় একলা ব'সে থাকি। বিনা প্রয়োজনে আমার কাছে বড় কেউ আসে না। হয়তো এইটাই আজকালকার নিয়ম। দেশটা বোধ হয় অতিরিক্ত রকম কেজো হ'য়ে গেছে, সবাই সব সময় নানা কাজে ব্যস্ত। সে কাজ যে সব সময় কাজের মত কাজই হবে তোমার আমার কাছে, তার কোনও মানে নেই। কারও আপিস আছে, কারও দোকান আছে, কারও বা পড়া আছে, কিন্তু আবার কারও আছে খেলা দেখা, কিম্বা সিনেমা দেখা, মীটিং করা, প্রোসেশন করা এমনি কত কিছু। কোনওটাই তুচ্ছ করবার জো নেই। যারা খেলা দেখে বেড়ায় তারা মনে করে যে একটা বড় খেলা না দেখতে পেলে জীবনটাই বৃথা হ'য়ে যাবে। তেমনি সিনেমায় একখানা নাম করা ছবি এলে তা' না দেখতে পাওয়াটা হবে অপরিশোধনীয় ক্ষতি—এমনি সবাই মনে করে, তাই সবাই এই নানা ধান্ধায় ব্যস্ত। তাই এই অচল স্থাণু বৃদ্ধের কাছে বসে অযথা শুধু "বাজে" গল্প, অর্থাৎ যে গল্পের সঙ্গে তাদের জীবনের প্রধান প্রয়োজনের কোনও সংস্রব নেই, তা ক'রতে তারা অবসর পায় না। হয় তো সেই জন্যই কি আত্মীয়-স্বজন, কি বন্ধুবান্ধব কেউ বড় একটা কাছে আসে না। বাড়ীর লোক, যাদের না এসে উপায় নেই তারা এসে হয় শরীর-গতিকের কথা জিজ্ঞাসাবাদ করে, না হয় ঘরের কথা দুটো আলাপ করে। বেশীক্ষণ সে কথায় রস জমে না।

যে বন্ধুরা নিতান্ত অহেতুকভাবে এসে আড্ডা জমাত আগে তারা প্রায় সবাই চ'লে গেছে। আর যিনি জীবনের অঙ্গে অঙ্গে মিশে তুচ্ছ কথাগুলিকে

গরীয়ান ক'রে তৃপ্তি পেতেন, মুহূর্ত সাহচর্যের ঐশ্বর্যে ভ'রে দিতেন সেই এক ও অদ্বিতীয় সঙ্গিনী আমার বিদায় নিয়ে গেছেন দশ বৎসর হ'লো।

তাই বার্ধক্যের দিনগুলি আমার বেশীর ভাগই থাকে ফাঁকে বোঝাই হ'য়ে, নিঃসঙ্গ অবসরে দিনের বেশীর ভাগ সময়ই কেটে যায় শুধু আপনার ভিতর আপনাকে ডুবিয়ে দিয়ে। হতাম যদি স্থবির, চিত্তের সব চঞ্চলতা লুপ্ত হ'য়ে যদি আমি জড়ত্বের আশ্রয় হ'তাম, তবে হয়তো এতে অতৃপ্তি হ'ত না। কিন্তু তা' আমি হই নি! চিত্ত আমার শতমুখে আপনাকে প্রকাশ করতে ব্যগ্র, দেহের অশক্তিই শুধু তাকে সীমাবদ্ধ ক'রে রেখেছে। তাই এই নিঃসঙ্গ অবসর আম'কে দারুণ পীড়া দেয়, কারও সঙ্গে কথা কইবার অবসর পেলে আমি বেঁচে যাই। কিন্তু আজকের এই বন্ধুসমাগম আমাকে পীড়া দিল। আজকের অভিজ্ঞতায় আমার অন্তরের একেবারে তলদেশ আলোড়ন ক'রে ভাবনা চিন্তা ওলোটপালট ক'রে দিয়েছিল। আমার হারানো দিনগুলি, কর্মময় গৌরবময় আনন্দময় সেই দিনগুলি আমার চোখের সামনে যেন ব্যঙ্গ নৃত্য ক'রে আমার আজকের সত্তাকে দুই পায় মাড়িয়ে যাচ্ছিল, কেবলই আমার মনে হ'চ্ছিল এমন হৃতসর্বস্ব জীবন ব'য়ে বেড়াবার কী সার্থকতা। শেষ বয়সে আমার স্ত্রী একটা কবিতা বার বার বলতেন।

কুসুমের গিয়াছে সৌরভ,
জীবনের গিয়াছে গৌরব,
এখন যা কিছু সকলি ফাঁকি
ঝরিতে ঝরিতে শুধু বাকী।

সেই কথাই বার বার মনে হচ্ছিল।

এমন অবস্থায় একান্ত নীরব নিঃসঙ্গতাই ছিল আমার কাম্য। তার মাঝখানে এই বন্ধুর দল এসে আমার পরম অগৌরবের এই দিনের ঘটনাগুলির বারবার পুনরাবৃত্তি করিয়ে পীড়া দিতে লাগলেন।

তারপর তাঁরা একে একে এই প্রসঙ্গে তাদের নিজেদের অতীত জীবনের ঘটনাগুলি টেনে দীর্ঘ আলোচনা আরম্ভ ক'রলেন।

একজন অবসর প্রাপ্ত পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট এই উপলক্ষে তাঁর জীবনের কাহিনী থেকে অনেকগুলি খানাতল্লাসীর কথা ব'লেগেলেন, কত রকম ফিকির ক'রে অপরাধীরা সব জিনিষ পত্র সরিয়ে ফেলবার চেষ্টা ক'রে তাঁর কৃতিত্বে ধরা প'ড়ে গিয়েছিল সে কথা বিশেষ করে জানালেন। ভূতপূর্ব ডেপুটিবাবুও ছাড়বার পাত্র নন, তিনি সেকালের বিপ্লবীদের বিচার ক'রতে ব'সে যত কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন সব ব'লে গেলেন। অবসর প্রাপ্ত ব্যবসায়ী বল্লেন তাঁর দোকানে একবার জবর খানাতল্লাসী হ'য়েছিল সে খবর। বল্লেন, "আপনার তো কিছুই করেনি মশায়! আমার দোকানে আর কিছু আস্ত রাখেনি, জিনিষ পত্র ভেঙ্গে চুরে ছড়িয়ে একেবারে তছ্‌নছ্‌ ক'রে দিয়েছিল। তার উপর আবার আমায় নিয়ে টানাটানি! দুটি হাজার টাকা ঘুষ দিয়ে তবে নিস্কৃতি পাই।" এই সব কথা ছেড়ে যখন এ'দের কথা প্রসঙ্গান্তরে গেল, তখন আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

নূতন প্রসঙ্গটি এদের চির পুরাতন, এদের এক সঙ্গে সমাবেশ হ'লে কথাটা সেই প্রসঙ্গে পরিণতি লাভ করবেই। প্রসঙ্গটি তাঁদের স্বাস্থ্য নিয়ে। এ'রা সবাই বোঝাতে চেষ্টা করেন যে সত্তর হোক বাহাত্তুর হ'ক যার যত বয়সই হোক না কেন তাঁরা খুব fit আছেন। অনেকেরই চেহারায় সেই "ফিট্‌" থাকার পরিচয় দেয় না বটে, কিন্তু তবু তাঁরা নিজেদের অস্থবির মনে করেন। আমার সামনে এ আলোচনা ক'রতে বসে সবারই বলতেই হয় আমাকে লক্ষ্য করে, "দাদা কিন্তু wonderful. আমাদের কত বড় তবু"—ইত্যাদি। এ'রা সবাই মনে করেন যে এত বয়সেও যে তাঁরা বেশ সুস্থ ও শক্ত আছেন তার হেতুটা তাঁরা অভ্রান্তভাবে নির্দেশ ক'রতে পারেন। একজন বলেন, তিনি রোজ দুবেলা দু' মাইল ক'রে হাঁটেন, তাই এমন শক্ত আছেন, আর একজন বলেন তাঁর খাওয়ার নিয়মের কথা আর একজন তাঁর বিশেষ একটি ওষুধের কথা, আর একজনের আস্থা তাঁর দৈনিক হুইস্কী সেবনের উপর।

বেঁচে আছেন, শক্ত সমর্থ আছেন এটা যেন স্রেফ এ'দের নিজেদের কৃতিত্ব আর সেই বেঁচে থাকাটাই এ'দের সুধু গর্বের বিষয় নয় একেবারে পরমার্থ

এমনি মনে হয় এদের কথা শুনে। বেঁচে থেকে কি ক'রছেন সে কথা বড় কেউ বলেন না, কেন না এ'দের সবাই কিছু করবার বাইরে—শুধু টি'কে থাকাটাই এ'দের একমাত্র সাধনা।

এদের কথা শুনে আমার মনে হ'ল এ'রা সবাই যেন বিশ্ববিধাতার কাছে হাত পেতে রয়েছেন আর একটু পরমায়ু ভিক্ষালাভের প্রতীক্ষায়। দেবতা তা' বিতরণ করছেন এ'দের মধ্যে, অন্নপূর্ণার মত মুক্তহস্তে নয়, Squeers এর মত ছোট্ট একটা চামচ দিয়ে—আর এ'রা সবাই Oilver Twistএর মত আরও চাই ব'লে শুধু হাস্যাস্পদ হ'চ্ছেন।

শুধু বেঁচে থাকাটাকে খুব বড় করে দেখতে আমি কোনও দিনই শিখতে পারিনি। পরমায়ু চেয়েছি আমি, চেয়েছি জীবন, দীর্ঘজীবন, কিন্তু সার্থক জীবন, এমন জীবন যার প্রতিটি মুহূর্ত থাকবে সার্থক কর্মে ভরা। কর্মময় জীবন পেয়েছিলাম আমি কিন্তু কর্মে সার্থকতায় বঞ্চিত হ'য়েই গেছি চিরদিন। আজ কর্মের দিন ফুরিয়েছে, চিন্তার শক্তি আছে। কিন্তু সে চিন্তা যাতে কোনও মতে সার্থক না হয় আমার ভাগ্য-বিধাতা যেন কোমর বেঁধে সেই অধ্যবসায়ে লিপ্ত হ'য়ে আছেন। তাই জীবন আমার হ'য়ে গেছে ফাঁকা। এমনি শূন্য অসার্থক জীবনের জের টেনে লম্বা করতে আমার অন্তরে আসে অবসাদ।

এ'দের কথায় আমার হ'চ্ছিল দারুণ শ্রান্তি, কিন্তু এ'দের তাতে শ্রান্তি নেই। এ'দের অবসর প্রচুর, কাজেই কথার এ'দের শেষ নেই। একদলের কথা শেষ যদি বা হয় আর এক দল এসে উপস্থিত হন।

এই বন্ধু সমাগমে পরিশ্রান্ত হ'য়ে অবশেষে যখন স্নানাহার আর না ক'রলে চলে না তখন এদের বিদায় দিয়ে মুক্তি পেলাম।

(৯)

কিন্তু তখনও স্নানাহার ক'রতে পারলাম না। এলো সুধাকান্ত।

আর সবার মত সে আসেনি, এসেছে উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদের মত! চুলগুলো উস্কো খুস্কো, বেশভূষা অপরিচ্ছন্ন, মুখ শুকনো।

ধপ ক'রে চেয়ারে ব'সেই সে ব'ল্লে, "সর্বনাশ হ'য়ে গেছে দাদা!"

চমকে উঠে ব্যস্ত হ'য়ে বল্লাম, "কেন?"

"আমার দুই নাতনি—পা-লি-য়ে-ছে।"

কথা ব'লতে সে যেন ভেঙ্গে প'ড়লো।

আরও ব্যস্ত হ'য়ে ব'ল্লাম, "সে কী? কবে? কোথায়?"

"কোথায় তা জানি না। খুঁজে খুঁজে হল্লাক হ'য়ে গেছি, কোনও সন্ধান পাইনি। কাল রাত্রে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে সিনেমায় না ষ্টুডিওয় যাবে ব'লে—আর ফেরেনি।"

সুধাকান্তের দুঃখে নিজের দুঃখ ভুলে গেলাম। অনেকক্ষণ ধ'রে তাকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করলাম। সন্ধান বিষয়ে তাকে দুটো পরামর্শ দিলাম।

অবশেষে সুধাকান্ত যখন চলে গেল তখন গিয়ে স্নানাহার ক'রলাম।

তারপর এলো আমার বড় বউমা—সুকুমারের মা।

আমার বড় ছেলে দূরদেশে বড় চাকরী ক'রতো। সে অল্পবয়সে মারা যায় বিদেশে কর্মস্থলে। যেদিন আমি সেখান থেকে বিধবা অনসূয়া ও ছ' মাসের ছেলে সুকুমারকে নিয়ে ঘরে ফিরলাম, সেদিনকার কথা ভুলবার নয়। আমার স্ত্রী ভূমিতে লুটোপুটি খেয়ে আর্তনাদ ক'রতে লাগলেন, অনসূয়া তাঁর পাশে ব'সে দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে কাঁদতে লাগলো। শিশু সুকুমার দেখে হতভম্ব হ'য়ে একবার মায়ের কাছে একবার ঠাকুরমার কাছে গিয়ে ঘে'সে ব'সতে লাগলো।

সে দৃশ্য ভুলবার নয়।

আজ অনসূয়াকে দেখে সেই দৃশ্য যেন আমার স্মৃতিপটে আবার সজীব

হ'য়ে উঠলো। অনেকদিন পরে আবার সেই পুত্রশোক—আর তার উপর পত্নীবিয়োগের দুঃখ উথলে উঠলো। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

অনসূয়ার সঙ্গে আমার খুব প্রীতির সম্পর্ক ছিল না। বিধবা পুত্রবধূকে আমার স্ত্রী বুকের ভিতর টেনে নিয়ে তার সেবা ও শান্তিবিধানের চেষ্টায় নিঃশেষে আত্মনিয়োগ ক'রেছিলেন। কিন্তু অনসূয়ার মনে সে সমাদর বিশেষ কোনও সাড়া দেয় নি। বিবাহের পর থেকেই সে আমাদের কাছ ছাড়া, স্বামীর সঙ্গে বিদেশে স্বচ্ছন্দতার সহিত স্বাধীনভাবে সংসার ক'রেছে সে। আমার ঘরের বধূ হ'য়ে থাকাটায় অনভ্যস্ততার বাধা সে পদে পদে অনুভব ক'রতো। ক্রমে তার অতৃপ্তি ও অসন্তোষ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠলো একটু অপ্রীতিকরভাবে! এভাবটা বেশী উগ্র হবার আগেই অনসূয়ার বাবা তাকে নিয়ে গেলেন। বৈবাহিকের আবেদনে বাধা দিতে আমাদের প্রবৃত্তি হ'ল না। অনসূয়া চলে গেল। কিন্তু আমার স্ত্রী বৈবাহিকের হাতে ধরে সাশ্রুনয়নে ভিক্ষা ক'রলেন শিশুটিকে। অনসূয়া কোনও আপত্তি ক'রলো না।

অনসূয়ার বাপের বাড়ী কলকাতায়ই। কাজেই তার ঘন ঘন আনাগোনা হ'ত, সুকুমারও মাঝে মাঝে তার কাছে গিয়ে থাকতো। কিন্তু শৈশব থেকেই সুকুমারের টানটা ছিল বেশীর ভাগ আমাদের উপর। তাই সে আমার বাড়ীতেই মানুষ হ'ল। মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্কটা অপ্রীতির না হ'লেও কখনও ঘনীভূত হবার অবসর পায় নি।

আমার স্ত্রী যখন মারা যান সুকুমার তখন সবে কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তিনি বার বার আমাকে ব'লে গিয়েছিলেন, "সুকুমারকে দেখো, ওকে যেন ওর মার হাতে ছেড়ে দিও না। সে ওকে যত্ন করে না, সেখানে গেলে ও মানুষ হবে না।" তাঁর এ অভিমত বিদ্বেষের ফল নয়। অনসূয়ার প্রতি তাঁর প্রীতির অভাব ছিল না। সে যে তাঁর স্নেহ ছেড়ে পিত্রালয়ে গেল এ বিষয়ে তাঁর একটা নিগূঢ় অভিমান ছিল। কিন্তু তার এই সাবধান বাণীর যথেষ্ট হেতু ছিল। আমার বড় বউমার চরিত্র ও কর্ম্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে বিচারে তিনি ভুল করেন নি।

তার প্রতি কোনও প্রকাশ্য বিরাগ না থাকলেও আমি অনসূয়াকে প্রীতির চক্ষে দেখতে পারিনি কোনও দিন। তার কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারে সে সর্ব্বদাই যেন আমাকে দূরে ঠেলে দিতো। তবু আজ যখন সে চোখ মুছতে মুছতে আমার কাছে এসে বসলো, তখন আমি অশ্রুরোধ করতে পারলাম না।

সুকুমার তার একমাত্র সন্তান, আর—একথাও নিজের কাছে অস্বীকার ক'রতে পরলাম না যে আমাদের স্নেহাতিশয্য তাকে সেই পুত্রের স্নেহে অনেকটা বঞ্চিত ক'রে রেখেছিল। আমরা সুকুমারকে নিজেদের কাছে রেখেছিলাম, তাকে মানুষ করবো বলে, আর কতকটা অভিমানেও বটে,—আমার পৌত্র পরের বাড়ীতে মানুষ হ'তে পারে না এই অভিমানে। অনসূয়ার মাতৃস্নেহের বেগ যে তার শ্বশুর-গৃহে বাসে বিতৃষ্ণা জয় ক'রতে পারেনি সে জন্য আমাদের অভিযোগও ছিল। কিন্তু আজ মনে হ'ল—সুকুমার যদিও সত্যি সত্যি মানুষ হ'য়েছে, কী শিক্ষায় কি চরিত্রগৌরবে আজ সে সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে—তবু ঠিক এমনি মানুষ হওয়া তো আমরা কেউ চাই নি। এমন মানুষ হওয়ায় তো মায়ের প্রাণ ভরবে না। যে মনুষ্যত্বের ভাগ্য হবে অবশ্যম্ভাবী নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনা, ঠিক সেই মনুষ্যত্ব আনন্দ দেবে না তার প্রিয়জনকে, দেবে অশেষ যাতনা। তাই মনে হ'ল সুকুমারকে যে মানুষ করবার প্রতিশ্রুতি আমি মনে মনে দিয়েছিলাম, সে প্রতিশ্রুতি আমি ঠিক রক্ষা করি নি। তাই মায়ের অশ্রুতে আমি দেখতে পেলাম আমার উপর এই নীরব অভিযোগ। সে অভিযোগের সামনে আমি সঙ্কুচিত হ'য়ে গেলাম।

অনসূয়া আমাকে ব'ল্ল "বাবা, আপনি সুকুমারকে মুক্ত ক'রে আনুন। একবার ওকে ফিরে পেলে আর অমি ওকে এ পথে যেতে দেবো না।"

একটা প্রচ্ছন্ন অভিযোগ একথার ভিতর ছিল, যেন মায়ের কাছ ছেড়ে থেকে, আমার কাছে থাকাতেই তার মতিগতি এমনি বিপথে গিয়েছে। বুকে একটা খোঁচা খেলাম. কিন্তু এ অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করবার মত মনের অবস্থা আমার ছিল না।

আমি শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ব'ল্লাম, "আমি কী ক'রতে পারি মা? আমার কী শক্তি?"

"আপনার খুব শক্তি আছে," বল্লে অনসূয়া, "আপনার মত প্রতিষ্ঠা আছে কার? আজকের যারা মন্ত্রী তাদের অনেকেই তো আপনার হাতে গড়া মানুষ, আপনার কাছে অল্পবিস্তর অনুগ্রহ তারা অনেকেই পেয়েছে, আপনার কথা তারা ঠেলতে পারবে না। তাদের ব'লবেন আপনি, আমি জামিন হ'চ্ছি আমাকে না মেরে ফেলে সে আর ও পথে যেতে পারবে না।"

সুকুমারকে মোটেই চেনে না অনসূয়া, তার মনের গতি অনুমান করবার শক্তি নেই ওর।

অনসূয়া যা ব'লেছে সে কথা সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়। আজকের মন্ত্রীদের মধ্যে প্রধান প্রধান যে কয়জন তাঁদের কেউ কেউ তাঁদের প্রথম জীবনে আমার কাছে কিছু উপকৃত হ'য়েছিলেন। এ'দের ক'জনকে আমি আমার প্রতিষ্ঠার দিনে প্রচুর সহায়তা করেছিলাম, আমার আনুকূল্য ছাড়া তাদের জীবনের উন্নতি হয় তো সম্ভব হ'ত না। কিন্তু সে কথা এখন কে মনে রাখতে গিয়েছে? মনে থাকলেও যে তারা সে কথা ভুলে যেতেই চাইবে না তা' কি সম্ভব? আর ধরতে গেলে আমি তাদের কতটুকুই বা করেছি। কেবল তাদের উন্নতির প্রথম দু' একটা ধাপে আমি হাতে ধ'রে তুলে দিয়েছিলাম বই তো নয়। তারপর যা হ'য়েছে তাদের সে জন্য তারা আমার কাছে মোটেই ঋণী নয় সেটা তাদের কৃতিত্ব ও ভাগ্যের ফল—সেই ভাগ্যের নাগরদোলা যাতে তাদের টেনে তুলেছে ঊর্ধে আর আমাকে নামিয়ে দিয়েছে এই প্রতিষ্ঠাহীন অকর্ম্মণ্যতার গহ্বরে।

আমি চুপ ক'রে ব'সে ভাবতে লাগলাম।

অনসূয়া আবার ব'ল্লে, "যান আপনি একবার তাদের কাছে। আপনি তাদের বুঝিয়ে ব'ল্লে তারা আপনার কথা ঠেলতে পারবে না।"

ভরসা হ'ল না আমার, কিন্তু অনসূয়ার মুখ চেয়ে স্বীকার হ'লাম। মনে মনে ভাবলাম, দেশের শাসনের যে নীতি মন্ত্রীরা গ্রহণ ক'রেছেন, আমার প্রতি

ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা যদি তাঁদের আজও থেকে থাকে শুধু তারই জন্যে কি তাঁরা তাদের নীতি পরিত্যাগ করবেন?

(১০)

অনেক দিন পর রাইটার্স বিল্ডিংসে গেলাম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। এখানকার আধুনিক হালচাল আমার মোটেই জানা ছিল না। আমার পূর্ব অভ্যাসমত আমি লিফ্‌টে উঠতে গেলাম। সঙ্গীন কাঁধে দু'জন আমার পথরোধ ক'রে দাঁড়াল।—পঁচিশ বৎসর আগে যখন এখানে আমার আনাগোনা ছিল তখন দু'ধারে চাপরাশী পুলিস যে যেখানে থাকতো আমাকে সেলাম ক'রে দাঁড়াত; কেরাণী, কর্ম্মচারী কারও সঙ্গে দেখা হ'লে তারা সসম্ভ্রমে নমস্কার ক'রে দাঁড়াত। তাই আজ হঠাৎ এমনি সম্বর্ধনা লাভ ক'রে চমকে গেলাম। তার পরেই আমার মনে হ'ল সে অনেক দিনের কথা, তখন আমাকে যারা চিনতো জানতো তাদের একটি প্রাণীও তো এখন সেক্রেটেরিয়াটে নেই। তাই এদের আচরণে কিছু অপমান বোধ ক'রলেও বিস্মিত হ'লাম না। আমি খুব চোস্ত হিন্দীতে নিজের পরিচয় দিলাম, যে দু'জন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছি তাদের নাম ক'রলাম। সিপাহী দুটো এসব শুনেও অবিচলিতভাবে আমার পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল, শুধু অঙ্গুলি সঙ্কেতে পশ্চিম দিকে দেখিয়ে ব'ল্লে "ও ধারে যান।"

পৃথিবীতে যে কত বড় একটা পরিবর্তন হ'য়ে গেছে এই বৎসরগুলির ভিতর এই কথাটায়ই হঠাৎ সেগুলি আমার মাথার ভিতর খেলে গেল। সিপাহীদের কথা শুনেই বুঝলাম এরা বাঙ্গালী।—সেকালে বাঙ্গালী সিপাহী কিংবা পাহারাওয়ালা ব'লতে গেলে ছিলই না। এদের সঙ্গে হিন্দী ব'লেছি ব'লে বেশ একটু অপ্রস্তুত বোধ হ'ল। পরে চারিদিকে চেয়ে দেখলাম সমস্ত রাইটার্স বিল্ডিংটাই যেন বাঙ্গালী বাঙ্গালী হ'য়ে গেছে। ইংরেজ শাসনে যতটা রম্‌রমা ভাব, কেরাণীদের মুখে চোখে যেমন একটা বিশেষ ভাব ছিল

সেটা যেন নেই। সবাই যেন অতিরিক্ত রকমে নিজেদের স্বাধীনভাবে এলিয়ে দিয়েছে।

সিপাহী-নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে দেখলাম আমার মত কতকগুলি দর্শনার্থী ব'সে আছে, কিন্তু কারও মুখে কোনও চাঞ্চল্য বা প্রতীক্ষার ভাব নেই, যেন তারা এখানে দিন কাটাতে এসেছে এমনি নিশ্চিন্তভাবে নিজেদের এলিয়ে দিয়েছে। একটা কাঠগড়ার ভিতর ব'সে আছেন একটি সার্জেন্ট আর একটি বাঙ্গালী ছোকরা। সার্জেন্টের কাছে গিয়ে আমি ইংরাজীতে আমার প্রয়োজন জানালাম, সার্জেন্ট আমাকে দু'খানা ফর্ম দিয়ে পরিষ্কার বাঙ্গালায় ব'ল্লে "আপনি ঐখানে বসে ফরম দুটো লিখে দিন আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

তার এই বাঙ্গলা সম্ভাষণে আর এক দফা ধাক্কা খেলাম—সার্জেন্টও বাঙ্গালী। ফিরিঙ্গি নয়! বাঙ্গলা কথায় একটু উৎসাহিত হ'য়ে বল্লাম, "দেখুন আমার বয়েস আশী বৎসরের বেশী, আমি তো এই সিঁড়ি দিয়ে উপরে যেতে পারবো না।"

সার্জেন্ট বেশ মিষ্ট ভাষায় ব'ল্লে, "আপনি ঐখানে বসুন আপনার জন্যে লিফ্‌টের ব্যবস্থা করছি।"

আমি ফরম লিখে সার্জেন্টের কাছে দিয়ে ব'সে রইলাম দীর্ঘ প্রতীক্ষায়।

আমার পরিচিত পুরাতন আবেষ্টনের যে সব পরিবর্ত্তন লক্ষ্য ক'রলাম, কোনওটাই অপ্রীতিকর হবার কোনও হেতু ছিল না, কিন্তু হঠাৎ এই নূতন আবহাওয়ার ভিতর প'ড়ে গিয়ে আমার যেন কেমন একটা খাপ না খাওয়া ভাব হ'ল। মনে হ'ল সবই যেন কেমন কেমন, যেন ঢিলেঢালা ভাব—সে কালের সেই চোস্ত কেতা দুরস্ত ভাব, ইংরেজী ও হিন্দুস্থানী ভাব ও ভাষার ছাপ যে নেই তাতে যেন আমি নিজেকে চট্ ক'রে মানিয়ে নিতে পারছিলাম না। সেই ছিমছাম স্মার্ট চট্‌পটে ভাবের অভাবে বেশ একটু ক্ষতি বোধ ক'রলাম। কিন্তু তার চেয়ে বেশী বোধ ক'রলাম এই কথা যে আমার 'অবসৃত জীবনের অবসরে পৃথিবীটা আমার অজ্ঞাতসারে যেন অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছে—তার সঙ্গে তালে তালে পা' ফেলে চলা আর আমার পক্ষে সম্ভব হ'চ্ছে না।

খুব বেশী দিন নয়, বছর তিনেক মাত্র আমি বাইরে বের হওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আমার তেতলা বাড়ীর দোতলার বড় বারান্দায় আমি আড্ডা গেড়েছি। সেখান থেকে উঠে দোতলার ক'খানা ঘরেই আমি ঘোরাফেরা করি। দোতলার বারান্দায়ই লোকজন এলে তাদের সঙ্গে দেখাশোনা করি, সবরকম খবরাখবর তাদের কাছেই পাই। তা' ছাড়া খবরের কাগজ পড়ি। দৃষ্টি একটু ক্ষীণ হওয়ায় নিজে বেশী প'ড়তে না পারলেও কতক পড়ি, কতক বা পড়িয়ে শুনি। খবরের কাগজে যতদূর দুনিয়ার খবর বের হয় তা' আমার অজানা নেই। জানি আমি হঠাৎ একদিন, বলা নেই কওয়া নেই, ইংরাজ রাজত্বের শেষ হ'য়ে গেছে দেশ স্বাধীন হ'য়ে গেছে। আজীবন আমি স্বাধীনতার কামনা ক'রেছি। যৌবনে এর জন্যে খুব জোর আন্দোলন ক'রেছি, কিন্তু ইদানীং আমার মনে একটু খট্‌কা বেধে গিয়েছিল। যাঁরা স্বাধীনতার আন্দোলন পরিচালনা ক'রছিলেন তাঁদের কথাবার্ত্তা চালচলন দেখে দেখে আমার মনে শঙ্কা হ'য়েছিল যে এ'রা যে স্বাধীনতা চান সেটা দেশের স্বাধীনতা, দেশবাসীর নয়—এ'দের শাসনের আদর্শ যেন ফ্যাসিষ্ট ঘেঁসা। ইংরাজের দেশের ব্যক্তি-স্বাধীনতাবাদ সমগ্র জগতে ছড়িয়ে গিয়ে গৌরবময় ইতিহাস রচনা ক'রেছে। এদের কাছে সেটা একটা বকেয়া আদর্শ—তার প্রতি এদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নেই। তাই স্বাধীনতা লাভে আমি খুব অম্লান তৃপ্তি লাভ ক'রতে পারিনি। তার উপর যখন দেখলাম সে স্বাধীনতার পত্তন হ'ল ভারতের দ্বিখণ্ডিত দেহের উপর, যাদের আমরা একদিন "ভাই ভাই এক ঠাঁই" ব'লে গান গেয়ে বুকে টেনে নিয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করেছিলাম তাদের ক'রে দেওয়া হ'ল পরদেশী, যখন দেখলাম একটা প্রবল শক্তিমান দল স্বাধীন ভারতকে নিছক হিন্দুর ভারত ব'লে দাবী চালাচ্ছেন এবং আর একদল স্বাধীন পাকিস্থানকে ক'রছেন ইসলামী রাষ্ট্র, তখন মনে হ'ল যে আমাদের যুগের প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর সাধনায় যে মিলিত ভারত ও ধর্ম্ম ও প্রদেশ-নিরপেক্ষ ভারতীয় নেশনের আদর্শ গড়ে উঠছিল, তার সমাধি হ'তে ব'সেছে—তখন প্রাণটা হাহাকার ক'রে উঠতো।

একটি যুবক সাংবাদিক হঠাৎ আমার সংস্পর্শে এসে প'ড়েছিল। তার সঙ্গে আলোচনা ক'রতে ক'রতে কোন একটা ঘরে গ্রামোফোন রেকর্ডে গান বেজে উঠলো ;

"আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে,
ঘরের হ'য়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে।"

কান পেতে গান শুনতে লাগলাম। আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে একটা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। আমি ব'ল্লাম, "এই গান আমাদের সেকালের আশা-আকাঙ্ক্ষার, আমাদের সেদিনের স্বপ্নের একটা প্রতিধ্বনি। কোথায় রইলো সে আশা-আকাঙ্ক্ষা!"

কথায় কথায় ব'ল্লাম সেই অতীতের কথা যখন মুষ্টিমেয় শিক্ষিত বাঙ্গালী পণ ক'রে প্রচার সুরু ক'রেছিল জাতীয়তার বাণীর, যখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সমগ্র উত্তর ভারত ভ্রমণ ক'রে ভারতকে শিখিয়েছিলেন সেই বাণী, একটা অভূতপূর্ব জাগরণের সাড়া জাগিয়ে তুলেছিলেন, যার ফল হ'ল কংগ্রেস। ব'ল্লাম আদি যুগের কংগ্রেসের অল্প কয়েকটি ভারতবাসী যে সূচনা ক'রলেন, দিনে দিনে তাতে কেমন ক'রে বৃদ্ধিলাভ ক'রে সর্বভারতে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুললো এক প্রচণ্ড জাতীয়তাবোধ। তারপর এলেন লর্ড কার্জন। বাঙলাকে ভেঙ্গে সেই আঘাতে বের ক'রলেন এক মহাকায় শক্তি যার ফলে সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করায় বরিশালে সেকালের ভূপেন্দ্রনাথ বসুর ভবিষ্যদ্বাণী —This is the beginning of the end of British Empire in India—সত্য সত্যই সফল হ'য়ে গেল। এ সব ইতিবৃত্ত আমার সাক্ষাৎ জ্ঞানের বিষয়, এর বিবরণ ছিল আমার ওষ্ঠাগ্রে—ছিল আমার অন্তরে রক্তের অক্ষরে লেখা।

সাংবাদিক নীরবেই শুনলেন, কিন্তু স্পষ্টই বুঝলাম যে, এ সব কথায় তাঁর অন্তর সায় দেয় না। ক্রমে তিনি মুখ ফুটেই ব'ল্লেন,

"যতই যা' বলুন, সেকালের কংগ্রেসের মূল কথা ছিল ইংরাজের কাছে

করজোড়ে ভিক্ষা মাগা ; সত্যিকার জাতীয়তাবোধ, যার ভিত্তি হ'চ্ছে জাতীয় সম্মানবোধ তার সূচনা হ'ল শুধু যখন গান্ধীজী এসে হাল ধ'রলেন ভারতকে শেখালেন এই দীনতা ও দাস মনোভাব পরিত্যাগ ক'রতে।" তাঁর কথায় নিষ্কর্ষ হ'ল এই যে—দেশে দেশাত্মবোধ প্রথম জাগিয়েছিলেন গান্ধীজী, তাঁর আগে যারা কংগ্রেস ক'রতো তারা ছিল ইংরেজের গোলাম। তর্ক ক'রলাম না আমি ; আমার অন্তরের তলা থেকে উঠলো একটা দীর্ঘশ্বাস, এই অজ্ঞ অন্ধ আধুনিকদের দেশের প্রকৃত ইতিহাস সম্বন্ধে এই দারুণ ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা, তার প্রতি এই বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী দেখে! এইটেই যে আজকের দিনের সবার মনের কথা, তা' জানতাম। তাই যখন কাগজে প'ড়তাম স্থানে স্থানে শ্রেণীতে শ্রেণীতে, প্রদেশে প্রদেশে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে তীব্র বিরোধের কথা, তখন অন্তরে হতাশা ভ'রে উঠতো। মনে হ'ত সুরেন্দ্রনাথের কাছে দীক্ষা নিয়ে যে স্বাধীনতার আদর্শ নিয়ে আমরা জীবন আরম্ভ ক'রেছিলাম সে স্বাধীনতা আমরা পাইনি। সে আদর্শ ছিল সমগ্র ভারতের, তার প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা সমৃদ্ধি ও শক্তি এক মহাভারতীয় জাতির স্বাধীনতা—তা' আজ বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। শঙ্কা হ'ত যে এ স্বাধীনতা বুঝি আমাদের মাতৃভূমিকে ও জাতিকে খণ্ডিত ও চূর্ণিত ক'রে ফেলবার প্রথম উদ্বোধন।

আমার কথা শুনে সাংবাদিকের ব্যবসায় বুদ্ধি হঠাৎ সচেতন হ'য়ে উঠলো। সে শেষে ব'ল্লে, "তা' আপনি লেখেন না কেন এ সব কথা?"

তার বোধ হয় মনে হ'ল যে এমনি একটা অদ্ভূত মত প্রচারে তাঁর কাগজের বেশ ভাল কপি হ'তে পারে।

আমি ব'ল্লাম, "লিখবো? তোমরা শুনে আমোদ পাবে ব'লে? সে পাঠ অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছি আমি অনেক ঘা' খেয়ে।

"আমায় ব'লো না লিখিতে ব'লো না
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা
শুধু মিছে কথা ছলনা।

এ যে বুকফাটা দুখে, গুমরিছে বুকে
গভীর মরম বেদনা।"

সাংবাদিক শেষে ব'ল্লেন, "আপনি বড় পেসিমিষ্ট। কেন না আপনি কবি—সেন্টিমেন্টাল। আমি স্বীকার করি যে আমাদের সেন্টিমেন্টের বিলাস নেই। আমরা রিয়ালিষ্ট—অবজেক্‌টিভ দৃষ্টিতে সব জিনিষ দেখতেই আমরা চেষ্টা করি।"

সেকালে কথায় কথায় আমার বিরুদ্ধবাদীরা ব'লতো আমায় আইডিয়ালিষ্ট—আর তারা প্রাক্‌টিক্যাল। কথাটা বদলেছে, নূতন ভাষা হ'চ্ছে "রিয়ালিষ্ট" "অবজেক্‌টিভ" যা' এদের মুখে খইয়ের মত ফোটে। কিন্তু আসল জিনিষ বদলায়নি। এদের কল্পনাশক্তি দুর্বল, নাকের ডগায় যেটা তার বাইরে এ'দের দৃষ্টি যায় না, তাই যাদের একটু দূরদৃষ্টি আছে তাদের দমন করবার জন্য সৃষ্টি হয় এই সব কথা।

আমাদের নূতন স্বাধীনতা নিয়ে ঘরে ব'সে অনেক ভেবেছি অনেক শঙ্কা অনুভব ক'রেছি। কিন্তু আমার সেই নিভৃত বারান্দায় ব'সে এ স্বাধীনতার সাক্ষাৎ স্পর্শ তবু পাইনি। আজ এই নূতন আবেষ্টনের মাঝখানে রাইটারস্‌ বিল্ডিংসে ব'সে প্রথম সাক্ষাৎ স্পর্শলাভ ক'রলাম। একটু খুসী হ'লাম, কিন্তু আবেষ্টনের নূতনত্ব ও অপরিচয়ে একটু অস্বস্তিও বোধ ক'রলাম।

অনেকক্ষণ পর আমার সাক্ষাতের নিমন্ত্রণ এলো একজন মন্ত্রীর কাছ থেকে, আর একজন লিখে দিলেন তাঁর ফুরসুৎ নেই।

"ফুরসুৎ নেই," আমার সঙ্গে দেখা করবার! ত্রিশ প'য়ত্রিশ বৎসর আগে যে উৎসাহী যুবক আমার পাশে পাশে শুধু আমার স্তবগান ক'রে বেড়াত, আমার বিদ্যাবুদ্ধি কর্ম্মশক্তির শতমুখ প্রশংসায় যে মুখর ছিল, তার কাছে আজ আমি অর্থী হ'য়ে এসেছি ব'লেই তাঁর বলতে হ'ল ফুরসুৎ নেই। কোনও মোলায়েম ওজুহাতের উল্লেখমাত্র নেই। মনে হল সেকালের বড় বড় ইংরেজ কর্ম্মচারীদের কথা, কোনও মান্যলোক যদি তাদের সাক্ষাৎ প্রার্থনা ক'রতো

তখন তাকে প্রত্যাখ্যান ক'রতে গেলেও তাঁরা মোলায়েম বাঁধিগৎ ব্যবহার ক'রতেন। স্বাধীন ভারতের এই "পপুলার" মন্ত্রী সে সব বাহ্যাড়ম্বরের আবশ্যকতা অনুভব করেন না। আমার সঙ্গে এর চেয়ে একটু সহৃদয়তার সহিত ব্যবহার ক'রলে কিছু ক্ষতি হ'ত না তাঁর কাজের!

যা' হোক অপর মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে গেলাম। তিনি আমাকে লিফ্‌টে ক'রে নিয়ে যাবার জন্য চাপরাশী পাঠিয়েছিলেন। লিফ্‌টে ক'রেই উঠে গেলাম।

(১১)

"আসুন, অনেকদিন পর আপনাকে দেখলাম। ভাল আছেন বেশ? ব'লে আসন থেকে উঠে এসে মন্ত্রীমশায় আমাকে চেয়ারে নিয়ে বসালেন। তাঁর আপ্যায়নে তৃপ্তিলাভ ক'রলাম।

এই মন্ত্রীটি বয়সে অপেক্ষাকৃত প্রবীণ। যদিও এ'র সঙ্গে অনেকদিন অনেক কাজ ক'রেছি, বেশ অন্তরঙ্গতাও ছিল এ'র সঙ্গে, তবু ইনি আমার কাছে কোনও দিন উপকৃত হ'ননি। তাই যিনি আমার কাছে বিশেষ উপকৃত হ'য়েছিলেন সেই মন্ত্রীটির রুক্ষ্ম ব্যবহারের পর এ'র কাছে আপ্যায়ন আমাকে একটু তৃপ্তিদান ক'রলো।

আসন গ্রহণ ক'রে তিনি সিগারেটের কৌটা খুলে আমার সামনে ধ'রলেন। একটা তুলে নিলাম, তিনিই তাতে আগুন ধরিয়া দিলেন।

টেবিলের অপর পার্শ্বে ব'সেছিলেন এ'র সেক্রেটারী, ইনি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, স্বাধীনতার ফলে দ্রুত পদোন্নতি লাভ ক'রে হ'য়েছেন সেক্রেটারী। তিনি আমাকে চেনেন না, আমিও তাঁকে চিনি না।

কাজের কথা মন্ত্রীমশায়ই আগে পাড়লেন। তিনি ব'ল্লেন, "আচ্ছা, আপনার নাতি, অমন ভাল ছেলে, সে অবশেষে কমিউনিষ্ট হ'য়ে গেল কেমন ক'রে?"

কি ব'লবো? এ কথায় ধ'রেই নেওয়া হ'ল যে কমিউনিষ্ট হওয়াটাই ব'খে যাওয়ার নামান্তর মাত্র ; যেন কমিউনিষ্ট মতবাদটাই একটা মহা নিন্দনীয় ব্যাপার।

আমি ব'ল্লাম, "সে আমি কেমন ক'রে বলবো বলুন। সে যে কমিউনিষ্ট তাও তো আমি ভাল ক'রে জানি না, শুনলাম আপনার পুলিসেরই কাছে।"

"তা' বটে, আজকাল ছেলেছোকরারা বুড়োদের চোখে ধুলো দিয়ে কত কীই যে ক'রে বেড়ায় তা' ক' জনই বা জানে? তা' এখন সে আছে কোথায়?"

আমি একটু সন্দিগ্ধ হ'লাম। মন্ত্রী ম'শায় ধ'রে নিয়েছেন সুকুমারের খবরাখবর আমি সব জানি আর তিনি মিষ্টি কথার ধাপ্পা দিয়ে সে খবর আমার কাছে আদায় ক'রবেন। আমি ব'ল্লাম,

"সে খবরটা আপনার কাছে জানতে পারবো আশা ক'রেই আমি এসেছি। আপনাদের পুলিসের কাছে শুনেছি যে তাকে ধরবার জন্যে কটকে লোক গেছে। তাই ভাবলাম আপনার সাহায্যে জানতে পারবো যে সে ধরা পড়েছে কি না এবং কোথায় আছে।"

মন্ত্রী সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "সুকুমারের কোনও খবর পাওয়া গেছে কি?"

সেক্রেটারী ব'ল্লেন, "না সে এখনো ধরা পড়েনি। আজ তার নামে হুলিয়া বের হ'য়েছে।"

এ একটা খবর!

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তার নামে অভিযোগটা কি জানতে পারি কি?

আবার সেক্রেটারীর প্রতি প্রশ্ন হ'ল। সেক্রটারী ব'ল্লেন, কোনও চার্জ্জ এখনো হয়নি, শুধু সে কমিউনিষ্ট পার্টির লোক, এখন গা'ঢাকা দিয়েছে এই।

একটু আলোচনা করবার চেষ্টা ক'রলাম। কমিউনিজমটাই কোনও অপরাধ নয়, এই সেদিনও তো কমিউনিষ্ট পার্টি ছিল কংগ্রেসেরই একটা শাখা। আজও অন্যান্য প্রদেশে কমিউনিষ্টরা অবাধে বিচরণ ক'রছে। অবশ্য কমিউনিষ্ট হ'য়ে যদি কেউ কোনও বিপ্লবী কাজ করে সে স্বতন্ত্র কথা।

মন্ত্রী হেসে ব'ল্লেন, "যা'ক ও সব পলিসির কথা আপনার সঙ্গে আলোচনা ক'রে কি হবে? অন্য প্রদেশের সঙ্গে বাঙ্গলাদেশের অনেক তফাৎ। এখানে কমিউনিষ্টেরা যে ষড়যন্ত্র ক'রছে তা' আপনি কিছু জানেন না, সে সব আপনাকে ব'লতেও পারি না আমি। কিন্তু একথা ব'লতে পারি যে, সুকুমার যদি ধরা দেয় তাতে তার উপকার বই অপকার হবে না। এখন ধরা দিলে সে শুধু আটক থাকবে, তাতে ভবিষ্যতে কোনও গুরুতর অপরাধে তার জড়িত হওয়া সম্ভব হবে না। আর আটক থাকলে—আপনার নাতি, আর সুকুমারের মত অমন ভাল লোক যাতে যথোচিত আরামে থাকে, সে ' ব্যবস্থা করবার প্রতিশ্রুতি আমি আপনাকে দিতে পারি।"

এরপর যে কথা হ'ল তার স্থূল মর্ম হ'ল এই যে সুকুমার কোথায় আছে সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ তাঁদের থাকলেও তাঁরা বলতে নারাজ, আর, সে ধরা না পড়া পর্য্যন্ত তাকে আটক না রাখার কোনও সম্ভাবনা এখন আলোচনাই হ'তে পারে না। তবে সে যদি ধরা দেয় এবং যদি গভর্ণমেন্টকে সন্তোষজনক প্রতিশ্রুতি দিতে পারে যে সে কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে কোনও সংস্রব রাখবে না, তবে তাকে শুধু ছেড়ে দেওয়া কেন, গভর্ণমেন্টের কোনও দায়িত্বশীল চাকরী দিতেও তাঁরা সম্মত আছেন।

আমি উঠলাম। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে আমাকে কোনও রকম অনুগ্রহ করবার কল্পনাও এ'দের নেই। এ'রা আমাকে সামনে পেয়ে সুকুমারের সন্ধান জানতে চান আর নানারকম লোভ দেখিয়ে আমাকে দিয়ে তার আত্মসমর্পণ করাতে চান। তাই উঠলাম।

মন্ত্রী মহাশয় আবার উঠে আমার সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রে ব'ল্লেন, "আপনি ভাল ক'রে ভেবে দেখুন, সুকুমারকেও বোঝাতে চেষ্টা করুন। আপনার মত লোকের মনে কোনও কষ্ট দিতে আমরা চাই না। আমাকে বিশ্বাস ক'রবেন।"

মনের ভিতরটা দপ্‌ ক'রে জ্বলে উঠলো। লোকটা কি এত বড় মূর্খ যে সে মনে করে যে তার কথার প্রকৃত ইঙ্গিতটা আমি ধরতে পারবো না। আমি বেশ একটু তীব্র স্বরেই বল্লাম, "বিশ্বাস ক'রবো কী? আপনি তো আমাকে

মোটেই বিশ্বাস করছেন না। একথা জানবেন যে সুকুমারের খবরের বিন্দু বিসর্গও আমি জানি না।"

দারুণ জ্বালা মনে বহন ক'রে ফিরে এলাম। এই মন্ত্রী, যাঁর হাঁড়ির খবর আমার জানা আছে, তিনি আমাকে মিথ্যাবাদী ব'লে সন্দেহ ক'রতে স্পর্দ্ধা করেন! সেদিন রাত্রে যখন সুকুমারকে নিয়ে গিয়েছিল তখন আমাকে কেউ কিছু জানান আবশ্যক মনে করেনি ব'লে পরের দিন আমার অভিমান হ'য়েছিল। এখন মনে হ'ল যে আমাকে যে কেউ কিছু জানায়নি সেটা আমার ও সুকুমারের সৌভাগ্য। কেন না মিথ্যা বলায় আমি অভ্যস্ত নই। তার খবর আমার সত্যি সত্যি জানা থাকলে হয় তো গোপন ক'রতে পারতাম না।

নিদারুণ অপমানের বোঝা ব'য়ে যখন বাড়ী ফিরে এলাম তখন রাগে আমার রক্ত টগ্ বগ ক'রে ফুটছে।

সামনে ছুটে এলো অনসূয়া। তাকে দেখে আমার মনটা আরও বিষিয়ে উঠলো। তার জন্যই তো আমাকে এতটা কষ্ট ক'রে গিয়ে ঐ তুচ্ছ লোকটার কাছে এতগুলো অপমান কুড়িয়ে আনতে হ'ল।

তাকে কিছু ব'ল্লাম না আমি, শুধু ব'ল্লাম, "কিছু হ'ল না।"

সে করুণ কণ্ঠে ব'ল্লে, "কেন হ'ল না বাবা?"

আমি ঝাঁঝিয়ে উঠে ব'ল্লাম, "কেমন ক'রে হবে? সে আমি তো আর নেই যার কথা দেশের লোক কান পেতে শুনতো, লাট সাহেব যার অনুরোধ রক্ষা ক'রে খুসী হ'ত। আমি যে আজ শুধু একটা নগণ্য তুচ্ছ বৃদ্ধ!"

তারপর ব'ল্লাম, "বেটার আস্পর্দ্ধা দেখ! আমার কথা শোনবার গরজ নেই তার, আমার কাছ থেকে পাম্প ক'রে বের ক'রতে চায় সুকুমারের খবর—ধ'রেই নিয়েছে সে যে আমি সব জানি।—কি না, সুকুমার ধরা দিলে তাঁরা তাকে আটক ক'রে রেখে আমার উপকার ক'রবেন! ছোটলোক কোথাকার!"

অনসূয়া কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ফুলে ফুলে শেষে ব'ল্লে, "সব আপনার দোষ!"

আমি জ্বলে উঠে ব'ল্লাম, "আমার দোষ?"

"দুশোবার ব'লবো আপনার দোষ, আমার কাছ থেকে ছেলে কেড়ে রাখলেন, মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে—কি না, তাকে মানুষ ক'রবেন ব'লে! কী মানুষই ক'রলেন! শুধু আস্কারা দিয়ে দিয়ে তাকে উচ্ছৃঙ্খল ক'রে তুললেন। আমাকে তুচ্ছ ক'রতে শেখালেন। মার কথা যে শোনে না ভাবে না, সে আবার মানুষ!"

ব'লে মুখ ফিরিয়ে তীব্রবেগে সে চলে গেল, চোখে কাপড় দিয়ে। তার পরই সে বাপের বাড়ী চ'লে গেল।

অনসূয়ার অভিযোগের উত্তর অনেক কথাই আমার বলবার ছিল, কিছু বলবার চেষ্টা ক'রলাম না। নিজের মনে আমার এ বিষয়ে গ্লানি ছিল। ছেলেপিলে মানুষ করা সম্বন্ধে আমি ছিলাম তাদের স্বাধীনতা দেবার পক্ষপাতী। সেই আদর্শ নিয়ে আমি সবার শিক্ষা দিয়েছি। আশানুরূপ ফল পাইনি। এখন মনে তাই হয় যে, হয় তো সারাজীবন যে পথে চলেছি সে পথটাই ভুল!

এতখানি পরিশ্রম ও উত্তেজনার ফল এতক্ষণে দেখা দিল। পা দুটো যেন পাথর হ'য়ে গেছে আর ডান পায়ে বাতের ব্যথাটা ভয়ানক চাড়া দিয়ে উঠেছে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে যাওয়া আমার সম্ভব হ'ল না, নীচের তলায় আমার মেজো ছেলে প্রবোধের বৈঠকখানার ইজিচেয়ারে ব'সে শরীরটা এলিয়ে দিলাম।

প্রবোধ উকীল। কিন্তু আজ তার ছুটি। কোনও ওকালতীর কাজ সে ক'রছিল না। তার কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা কইছিল। এর আগে এখান থেকে উচ্চ হাস্য ধ্বনি শুনতে পেয়েছিলাম।

আমি আসতেই এদের সবার মুখ বন্ধ হ'য়ে গেল। আমি একলা ব'সে রইলাম।

কেন থাকবে তারা? তাদের উল্লাসময় জীবনের মাঝখানে আমি একটা বেয়াড়া বাধা বই তো নই।

যে বারান্দায় আমি ইজিচেয়ারে ব'সে থাকি তার পাশে একটা গলির

ওপারে একখানা ছোট বাড়ী। বাড়ীখানা একেবারে আমার চোখের সামনে, তাই সেখানকার লোকজন হামেশাই আমি দেখতে পাই।

সেদিন দেখলাম সেই বারান্দায় ব'সে একটি বৃদ্ধ একটা থেলো হুঁকোর জল বদলে, কল্কে নিয়ে টিপে তামাক সাজছে। তামাক সাজা হ'লে ফুঁদিয়ে টিকের আগুন ধরাতে লাগলো।

বুড়োর দিকে চেয়ে আমার কী যেন এক অপূর্ব কৌতূহল হ'ল, চেয়ে রইলাম বদ্ধদৃষ্টি হ'য়ে তার দিকে।

লম্বা লম্বা পাকা দাড়ী, তার মাথায় যে চুল অবশিষ্ট আছে তা' একেবারে পাটের মত ধপ্ ধপে। গৌরবর্ণ, সুগঠিত মুখ, খুব বেশী পলিত নয়। খাড়া হ'য়ে সে দাঁড়ায় নুইয়ে পড়েনি।

তামাকটা ধরান হ'লে সে ব'সে হুঁকো ফুড়ুক ফুড়ুক ক'রে টানতে লাগলো সেখানে ব'সেই।

হঠাৎ মনে হ'ল লোকটি যেন আমার চেনা, মুখ দেখে নয়, তার হাত-পা মাথা নাড়ার রকম দেখে। কবে যেন কাকে দেখছি ঠিক এমনি ক'রতে।

আমি উঠে এগিয়ে গেলাম সেই বাড়ীর একেবারে সামনাসামনি জায়গায় আর মনের ভিতর হাতড়াতে লাগলাম।

আমি সেখানে দাঁড়াতেই লোকটি আমার দিকে তাকিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে ব'ল্লে, "শশাঙ্কবাবু না?"

তার কথা শুনে চট্ ক'রে সব মনে প'ড়ে গেল। আমি ব'ল্লাম, "আরে! কুঞ্জ!—একবার এসো না।"

সে তড়াক ক'রে উঠে হুঁকো টানতে টানতেই চ'লে এলো। এসেই ব'ল্লে,

"তা হ'লে তুমি বেঁচে আছ?"

"তোমার কি মনে হয়? তুমি আছ তো?"

হেসে সে ব'ল্লে, "খুব আছি, বেশ আছি। তুমিও তো মন্দ আছ মনে হ'চ্ছে না।"

কুঞ্জ ছিল আমাদের ক্লাসের একটি ভাল ছেলে। স্কলারশিপ পেতো।

বি. এ, পরীক্ষায় ইংরাজী ও দর্শন দুই বিষয়ে অনার নিয়ে পাশ ক'রেছিল, কিন্তু দুটোতেই সেকেন্ড ক্লাশ।

তারপর সে আর এম. এ. প'ড়লে না। স্কলারশিপ পেলো না, বাড়ীর অবস্থাও তত ভাল নয়, তাই সে চাকরীর চেষ্টা ক'রতে লাগলো; পেলোও। ইংরাজীটা সে খুব ভাল জানতো ; মুরুব্বীও ছিল তার, তাই সে গভর্ণমেন্ট ট্রানস্লেটারের অধীনে একটা চাকরী পেলো, মাইনে প'চাত্তর টাকা।

সে কালে ফার্ষ্ট ক্লাশ এম. এ. পাশ ক'রলেও ডেপুটি না হ'তে পারলে তার মাসিক মূল্য এর চেয়ে বেশী ছিল না। প্রাইভেট কলেজে ৭৫৲ টাকা থেকে গভর্ণমেন্ট সার্ভিসে ১৫০৲ টাকায় আরম্ভ ক'রতে হ'ত। তাই কুঞ্জ যে এ চাকরীটা ভাল মনে করবে তা আশ্চর্য্য নয়। বিশেষ সেক্রেটারিয়েটের চাকরীতে উন্নতির আশা আছে।

উন্নতি যথানিয়মে হ'য়ে ছিল তার। শেষে যখন পেন্সন নেয় তখন তার মাইনে হ'য়েছিল আটশো টাকা। সেকালে শিক্ষা বিভাগে যারা প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসে ঢুকতো তাদের উন্নতির সীমা ছিল ছয় শো, কিন্তু তত দূরও খুব কম লোকেই পে'ছুতো।

কলেজ ছেড়েই কুঞ্জ তাই খুশী হ'য়ে আফিস ক'রতে লাগলো, আর আমরা এম. এ. বি, এল প্রভৃতি প'ড়তে লাগলাম। তাতে কুঞ্জ আমাদের উপর মুরুব্বীয়ানা ক'রতো, কেন না আমরা ছাত্র, আর সে অফিসার।

কোনও দিনও কাজে অতৃপ্তি দেখিনি তার। এর দশ বছর পর, ব'লতে গেলে এক ছোকরা, যাকে আমরা কলেজে থাকতে স্কুলে প'ড়তে দেখেছি সেই হ'ল ট্রানস্লেটার, কুঞ্জর বড় কর্তা। তাতে সে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা অনুভব করেনি, নির্বিবাদে তার অধীনে কাজ কর'তো, তার হুকুম তামিল ক'রতো, মাঝে মাঝে বকুনিও খেতো। তাতে কোনও লজ্জা বা গ্লানি ছিল না তার।

তারপর আমাদের কর্মক্ষেত্র হয়ে গেল ভিন্ন। বাঙ্গলা জোড়া লেগে যখন বেহার বেরিয়ে গেল তখন কুঞ্জর উন্নতি হ'য়ে সে হ'ল পাটনা সেক্রেটারিয়াটে

একজন হেড অ্যাসিষ্ট্যান্ট। সেখান থেকেই শেষে রেজিষ্ট্রার হ'য়ে সে অবসর নেয়। তখন থেকে আর তার সঙ্গে দেখাশোনা হয়নি আমার।

আমি বল্লাম, "এখানে কবে এলে?"

"এই দুদিন হ'ল এসেছি, কালই চ'লে যাব।"

"কোথায় থাক?"

"রাঁচীতে একখানা ছোটখাটো বাড়ী ক'রেছি. সেখানেই থাকি, চাষবাস করি একটু। এখানে এসেছি মেয়েটাকে একবার দেখতে, বড্ড অসুখ হ'য়েছিল তার।"

আমি ব'ল্লাম, "তা' ও বাড়ীতে কি ক'রে এলে? ওখানে তো পাঞ্জাবীরা থাকে।"

"হাঁ ভাই, সেই পাঞ্জাবীই আমার জামাই। পাটনায় ছিল কিছুদিন রেলের চাকরীতে, সেইখানে আমার মেয়ে ওকে পটিয়েছিল।"—হেসে সে ব'ল্লে. "তাই কন্যাদায় বড় সহজে মিটে গেছে, নিখরচায়।"

অবাক ক'রলে আমায়!

সেকালের লোক কুঞ্জ, সেকালের বারো আনা লোক মেয়েদের এমনি অজাতে বিদেশীর সঙ্গে স্বচ্ছন্দ বিবাহে ভয়ানক গ্লানি বোধ ক'রতো। কিন্তু কুঞ্জ খুসী—কোনও গ্লানি নেই তার। সে গেরস্ত মানুষ টাকার হিসাবটা তার কাছে বড়। কোনও ঝঞ্ঝাটের মধ্যে সে নেই। যখন যা' হয় তার, তা নিয়ে সে বিরোধিতা ক'রে হৈ চৈ করে না, অম্লান বদনে সেটা মেনে নেয়। এই তার স্বভাব।

ছাত্রজীবনে কুঞ্জকে জানতাম খুব ভাল ছেলে ব'লে। পড়ার নেশা তার খুব ছিল। কলেজে থাকতে দেখতাম সে রাজ্যের সব বই প'ড়েছে যার নামও আমি তার কাছেই প্রথম শুনতাম। পৃথিবীর সব জিনিষের এত খবর রাখতো সে, যে তাকে আমরা চলন্ত বিশ্বকোষ ব'লে ঠাট্টা ক'রতাম। যে কোনও বিষয়ে কথা উঠলে সে সেবিষয়ে এত সব তথ্য ব'লতো যা আমাদের কারও জানা ছিল না।

তার সাংসারিক ও বৈষয়িক কথাবার্তা হ'তে হ'তে মনে হ'ল সেদিনকার সে কুঞ্জ নেই! দীর্ঘকাল কেরাণীগিরি ক'রে তার ভিতরকার পণ্ডিতটি গেছে ম'রে, সে হ'য়ে গেছে সুধু "দস্তুরমত সংসারী।" চাল ডাল নুন তেলের হিসাব থেকে জমি বাড়ীর দরদাম পর্য্যন্ত তার চিন্তার পরিধি।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বুঝলাম যে ভুল বুঝেছি।

কথাটা তুললে সেই। আমার বিশ বছরের পুরোণো লেখা একখানা বইয়ের উল্লেখ ক'রে—তার নামও সবাই ভুলে গেছে। সেই সম্বন্ধে তার আলোচনায় বুঝতে পারলাম যে সে বইখানা ভাল ক'রেই প'ড়েছে সূক্ষ্মদৃষ্টি সমালোচকের মত।

তারপর সে ব'ল্লে, "তুমি এখন আর লেখ না?"

আমি ব'ল্লাম, "না। বারো বছর আগে বিরক্ত হ'য়ে লেখা ছেড়ে দিয়েছি।"

"হাঁ তাই ভেবেছিলুম। তুমি ভারতের অর্থনৈতিক প্ল্যান সম্বন্ধে একখানা চটি বই লিখেছিলে তা প'ড়ে ভাল লেগেছিল। সেই বোধহয় তোমার শেষ বই।"

"হাঁ।"

"কিন্তু তোমার মতের সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ মিল নেই।" ব'লে সে আমার সেদিনকার মতামতের যে সমালোচনা ক'রলে তাতে শুধু তার সূক্ষ্ম বিবেচনা শক্তি প্রকাশ হ'ল না, প্রকাশ হ'ল বিশ্বের অর্থ-নীতির তথ্য সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান।

দেখতে পেলাম চলন্ত বিশ্বকোষ সে এখনও আছে। বিশ্বের যত খবর, যত বই আছে সব তার জিহ্বাগ্রে। টকাটক ব'লে দিতে পারে সে আজ পর্য্যন্ত জগতে কোথায় কি বড় কাজ বা বড় কথা হ'য়েছে।

অবাক হ'লাম আমি। তার ধীশক্তি এখনও অটুট আছে, বিদ্যার অনুশীলনে তার এখনও শ্রান্তি নেই। সব বিষয়েই তার মতামত ঠিক হোক ভুল হোক, গভীর বিবেচনা ও অধ্যয়নের উপর প্রতিষ্ঠিত।—তার ব্যাপক বিদ্যা ও বুদ্ধির কাছে নিজেকে বড় খাটো মনে হ'ল।

ভাবতে দুঃখ হ'ল যে এতখানি বুদ্ধি, এত বড় প্রজ্ঞা একেবারে বন্ধ্যা হ'য়ে ডুবে র'য়েছে শুধু আর দশ জনের মত কেবল সুখে স্বচ্ছন্দে সুষ্ঠুভাবে সংসারযাত্রা নিৰ্ব্বাহে। কোনও আগ্রহ নেই তার এ জ্ঞানকে ফলপ্রসূ করবার। জ্ঞান অর্জ্জন ক'রেই সে পরিতৃপ্ত।

ব'ল্লাম তাকে, "এত পড়াশোনা কর তুমি, এত বোঝ, এর ভাগ দিচ্ছ না তুমি দেশের লোককে। তোমার সঙ্গে সঙ্গেই এসব লোপ পেয়ে যাবে? কিছু লেখনি তো কোনও দিন।"

"তোমার কথা শুনে সেক্সপীয়ারের **Venus and Adonis**এর কথা মনে হ'চ্ছে এত রূপ কী লোপ হ'য়ে যাবে পৃথিবী থেকে?" হেসে সে ব'ল্লে, "কিন্তু ভাই আমার ওসব আসে না। মুখে মুখে দু কথা ব'লতে পারি, লিখতে ইচ্ছা করে না। ততক্ষণ ক্ষেতে-খামারে ঘুরে এলে কাজও হয় দেহ মনও ভাল থাকে।"

কুঞ্জর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধ'রে কথা কইলাম।—সে কথা সুধাকান্তের মত অতীতের বিজৃম্ভণ নয়, বর্ত্তমানের তাজা কথা, টাটকা আওয়াজ তার। ভারী ভাল লাগলো। আরও ভাল লাগলো এই দেখে যে এর মত লোক আমার সব লেখা প'ড়েছে, বুঝেছে, তাই নিয়ে চিন্তা ক'রেছে। আমার অজানা এমনি লোক হয় তো অনেক আছে। হয় তো তাদের হাতে প'ড়ে আমার চিন্তা সফলতা লাভ ক'রেছে।

সে চ'লে যাবার পর ভাবতে লাগলাম এই আশ্চার্য্য মানুষটির কথা! বিদ্যা ও বুদ্ধির জাহাজ সে, কিন্তু তার সে গৌরব সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃত! সব জিনিষ ভাবে সে, ভেবে চিন্তে প্রত্যেক বিষয়ে যে মত স্থির করে তা ওজনে ভারী। কিন্তু তা' প্রকাশ করবার জন্য ছট্‌ফটানি তার কোনও দিনই নেই। জেনেই সে পরিতৃপ্ত। তার জ্ঞানের পিপাসা পরিতৃপ্ত করবার জন্য পৃথিবীতে অগণিত পণ্ডিত অধ্যবসায় ক'রছেন, তাতেই সে খুসী, সেই শিক্ষাদাতাদের পদবীতে ওঠবার তার কোনও আকাঙ্ক্ষা নেই, জীবনের কোনও আদর্শের বালাই নেই।

মনে হ'ল এমনি ক'রে সে তার বিশাল শক্তির অপচয় ক'রছে। এটা তার স্বার্থপরতা।

কিন্তু তারপরেই মনে হ'ল বেশ তো আছে ও। কোনও আদর্শ বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার জীবনের শান্তি ও তৃপ্তি নাশ করে না। জ্ঞানেই সে তুষ্ট, তার বেশী সে কিছু চায় না। শান্তিতে আছে সে, সুখী সে।

তার সাংসারিক জীবনে যা ঘটেছে শুনলাম তাতে আমার মত লোক অস্থির হ'য়ে যেতো। স্বেচ্ছাচারী কন্যা তার মতের অপেক্ষা না ক'রে পাঞ্জাবী বিয়ে ক'রেছে। একটা ছেলে বাপের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে চ'লে গেছে বিদেশে, কোনও খবরও নেয় না সে তার। নাতি-নাতনীদের মধ্যে কেউ কেউ জেলে গেছে। এসব তার প্রশান্ত জীবনে কোনও তরঙ্গই তোলে না।

সে বেশ আছে। নিজের বাড়ী আছে, চাষের জমী আছে, ঘরে গরু আছে, মরাইয়ে ধান আছে, তরীতরকারী কিনতে হয় না। দিনরাত এই সব দেখা শোনা করে খায় দায় ভাল, পরম আরামে থাকে আর ঘরে ব'সে কেবল পড়ে। জগতের কাছে সে চায় নি কিছুই, যা পেয়েছে নিয়ে খুসী হ'য়েছে! দুনিয়ার কুম্ভীপাক দূর থেকে দেখে শুধু, তার ভিতর আঙ্গুল ডুবিয়ে পুড়ে মরবার চেষ্টা নেই তার, আমার মতন।

মনে হ'ল আমি যদি এমনি হ'তাম! তবে এখনকার চেয়ে অনেক সুখী হতে পারতাম। আমার ছিল আদর্শ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার ছটফটানি। তাই সে কুম্ভীপাকে আকণ্ঠ ডুবে হাহাকার ক'রেছি—অনেক চেয়েছি দুনিয়ার কাছে, তাই না পেয়ে কেঁদে মরেছি। আদর্শের জন্য—ভস্মে ঘি ঢেলেছি। অর্জন ক'রেছি শুধু ব্যর্থতার হতাশা!

সুকুমারও আমারই মত—আমার চেয়ে বেশী ভুগছে বেয়াড়া আদর্শের তাড়নায়। তারও হয়তো আমার মত শুধু ভস্মেই ঘি ঢালতে হবে।—তার চেয়ে যদি শিক্ষা দিতাম কুঞ্জর আদর্শে, তাতে সুখ পেতো সে, আমারও বৃদ্ধ বয়সে এ দুঃখ সইতে হ'ত না।

মনে হ'ল সুকুমারও ঠিক আমারই মত। নিশ্চেষ্ট নিরবচ্ছিন্ন সুখ তাকে

শুধু ক্লান্তই ক'রবে, অস্থির ক'রে তুলবে। আজ তারও আমারই মত জীবনের কাম্য সুখ নয়—কর্ম্ম ও সার্থকতা! কর্ম্ম ও চেষ্টা ছেড়ে সুখ—হাতে পেলেও সে তুলে নেবে না!

তারপরেই মনে হ'ল সুখ শান্তিটাই কি সবচেয়ে বড় কথা? শুধু সুখেই কি তৃপ্তি হয়?

সুখবাদী দার্শনিকের মতে শুধু সুখছাড়া লোকের কিছুই কাম্য নেই। এই কথা নিয়ে তাঁরা কত বড় বড় বই লিখে গেছেন।

কিন্তু সুখ পাওয়া ও দুঃখ বর্জ্জনই যদি মানুষের জীবনের একমাত্র কাম্য হয় তবে কেন লোকে দুঃখকেই তাদের সাধনা ব'লে বরণ ক'রে নেয়?

যে শিশুকে জন্ম দিতে মাতার হ'য়েছিল জীবন সংশয়, পরমুহূর্ত্তেই সেই শিশু হ'য়ে ওঠে মায়ের নয়নের মণি—তার কাছে জগতের সব কিছু, মরণ বাঁচন সব হ'য়ে যায় তুচ্ছ। যখন শিশু বড় হয়, তুচ্ছ করে সে মাকে, হয়তো যাতনায় পীড়িত ক'রে তোলে তাকে। যে সব সুখের স্বপ্ন গ'ড়েছিল মাতা শিশুকে কেন্দ্র ক'রে সব হ'য়ে যায় চূর্ণ-বিচূর্ণ। তবু স্নেহ প'ড়ে থাকে সন্তানের পদপ্রান্তে। সুখের শেষ আশাটুকু যখন লুপ্ত হ'য়ে যায়, তখনও কিসের এ মোহ, যাতে মাতা তবু মেতে থাকে সে সন্তান নিয়ে, তরই ভাল মন্দ করে তার জীবন তোলপাড়?

সুখটাকে জীবনে যত বড় ক'রেই দেখি আসলে আমাদের জীবনের হিসাবে সেটা গৌণ ও তুচ্ছ। দুঃখকেই দিনরাত বরণ ক'রে জীবন কাটাই, —এই দুঃখই শুধু সবটুকু নয়, সার্থকতা আছে এর গর্ভে এই আশায়।

সে আশার কতটুকু মেটে? ক'জনের?

কিন্তু আশা মিটুক না মিটুক, শুধু সুখ পাই না ব'লে সেই দুঃখের সাধনা কে কবে ছাড়তে পারে?

কুঞ্জের মত সুখ জীবনে পাই নি আমি—ছটফটিয়ে ম'রেছি জীবনভরা দুঃখের সঙ্গে ধবস্তাধবস্তি ক'রে। কিন্তু—আজও এত হতাশা পেয়েও ভাবতে

পারছিনে যে সেই চেষ্টার পরিবর্ত্তে শুধু প্রশান্ত দ্বন্দ্বহীন সুখ কেউ হাতে তুলে দিলে তা নিয়ে তৃপ্তি পেতাম আমি।

সুকুমার কোথায় আছে, কোনও খবরই আমি জানি না। বেঁচে আছে কিনা তাও জানিনা। তার কথা দিনরাত ভাবি—ভাবতে ভয়ে প্রাণ কেঁপে ওঠে! মনে হয় শুধু, বুঝি সে বেঁচে নেই—না হয় কত কষ্টই সে, না জানি, পাচ্ছে। তার সে কষ্টে আমার কিছুই করবার সাধ্য নেই!

(১২)

কয়েকমাস পরে একখানা দীর্ঘপত্র পেয়ে আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। চিঠি লিখেছে একটি মেয়ে—আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত। চিঠিখানি এই ঃ—

আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত। আমার এ চিঠির উদ্দেশ্য সিদ্ধ ক'রতে হ'লে তাই আপনাকে আমার পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

আমার নাম মণিকা ভট্টাচার্য্য। আমি বেশ ভাল ক'রেই বি, এ, পাশ ক'রেছিলাম। এ বছর আমার এম. এ. দেবার কথা। ঘটনাচক্রে এমন অবস্থায় প'ড়েছি যে এম, এ দেওয়া আর ঘটে উঠবে না বোধ হয়।

কয়েক বৎসর থেকে আমি কমিউনিষ্ট দলের সঙ্গে ঘনিষ্ট হ'য়ে প'ড়েছি। সেই সূত্রে আপনার নাতি সুকুমারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। সেই পরিচয় খুব ঘনিষ্ট হ'য়ে উঠলো তার সঙ্গে কাজ ক'রতে ক'রতে। তার অপূর্ব্ব চরিত্র, তার অনন্যসাধারণ কর্ম্মনিষ্ঠা দেশপ্রীতি ও প্রগাঢ় বিদ্যা এবং বিশেষ ক'রে অর্থনীতি ও সমাজনীতির জ্ঞান আমাকে অভিভূত ক'রেছে। তারই কাছে আমি পূর্ণদীক্ষা পেয়েছি কমিউনিষ্ট দলের।

সেদিন যে সভায় সুকুমার আহত হয় সেখানে আমি উপস্থিত ছিলাম, সুকুমারের পাশে। আঘাত পেয়ে সুকুমার আমারই কোলে ঢ'লে প'ড়েছিল। আমিই তাকে নিয়ে পালিয়ে শুশ্রূষা ক'রেছিলাম। সেই রাত্রে যখন আমাদের গা ঢাকা দেবার সিদ্ধান্ত হ'ল তখন আমিও

সুকুমারের সঙ্গেই পালিয়ে এলাম। সেইদিন থেকে আমি দিবারাত্রি তার সঙ্গেই আছি, তার সঙ্গেই সব বিপদ সকল শঙ্কার ভিতর দিন কাটাচ্ছি।

সুকুমারের সম্পর্কে আপনি আমার ঠাকুর্দা। আপনাকে অসঙ্কোচে ব'লতে পারি সব কথা। বরাবরই তাকে দেবতার মত ভক্তি ক'রতাম, কিন্তু এই ক'মাসে সে হ'য়ে গেছে আমার অন্তরের অন্তরতম। লোকের চক্ষে কবে কি হবে জানি না, কিন্তু আমাদের অন্তর দেবতার চক্ষে আমরা স্বামী স্ত্রী—এবং আমার ভরসা আছে যে আমি তার প্রকৃত সহধর্মিনী হবার স্পর্ধা করতে পারি।

তাই আপনাকে জানাচ্ছি যে সুকুমার বড় কষ্টে আছে। দিনরাত পুলিসের লোকের চক্ষে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়াতে কী যে অশেষ কষ্ট তা' এই ক' মাসেই হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছি। সুকুমার কিন্তু এসব গ্রাহ্যও করে না। মরণের মুখে আমাদের প'ড়তে হ'য়েছে দু, তিন বার, কিন্তু কোনও দিন সে বিচলিত হয়নি, তার বলিষ্ঠ বাহুতে ধারণ ক'রে আমাকে রক্ষা ক'রতেই সে ব্যস্ত হ'য়েছে।

এসব কষ্ট সে গ্রাহ্য করে না। কিন্তু তবু তার মনে যে সুখ নেই, অন্তরে তার কী যে ব্যথা সে কথা আমি আমার অন্তর দিয়ে বুঝি। দেশের সেবা যার জীবনের প্রতিমুহূর্তের নিঃশ্বাসের বায়ু তার পক্ষে সব কাজ থেকে ছুটি নিয়ে শুধু নিজের জীবন ও স্বাধীনতা টায়-টোয়ে রক্ষা করবার সাধনা দিনরাত করা কী যে কষ্ট—কি যে ব্যর্থতা বোধ তা' থেকে আসে তা আপনি হয় তো বুঝতে পারবেন। খবরের কাগজে দেশের নানাদিকে নানা দুঃখ দুর্গতির কথা সে পড়ে। ভাবে সে, যে দেশের এ দুর্দিনে তার কিছু করবার শক্তি নেই, সুযোগ নেই। কেবল কোনও মতে পালিয়ে বেড়ানটাই তার পরামার্থ। এই কথা ভেবে ভেবে তার মন তীব্র জ্বালায় অস্থির হ'য়ে ওঠে, মুখ চোখ লাল ক'রে সে গুম্ হ'য়ে ব'সে থাকে তার কিছু করবার অক্ষমতায়।

দাদু, এ অবস্থায় কী করা যায়। আমার মনে অনেক কথা আসে, কিন্তু তাকে সে কথা বলবার সাহস আমার নেই। আমার মনে হয় যে এমনি ক'রে, সব কাজের মত কাজ থেকে ছুটি নিয়ে কেবল কোনও মতে আত্মরক্ষা ক'রে

বেঁচে থাকার চেয়ে, যদি উনি প্রকাশ্যভাবে কমিউনিস্ট পার্টি ত্যাগ ক'রে দেশের জন্য আর যে সব লক্ষ লক্ষ কাজ র'য়েছে তাই করেন তবেই বোধ হয় ভাল হয়। আমি ভাবি তাই মাঝে মাঝে, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারি না। ব'ল্লে হয় তো উনি ভাববেন যে দুঃখ কষ্ট আর সহ্য করবার মত বীরত্ব আমার নেই। হয় তো আমাকে ঘৃণা ক'রবেন। এ অবিচার এ জ্বালা আমি সইতে পারবো না।

কিন্তু সুকুমারের এই চাপা বুকফাটা দুঃখ দিনের পর দিন চোখ দিয়ে দেখেও তো সইতে পারিনা। বুক ভেঙ্গে যায় আমার।

আপনি শুধু এর একটা উপায় ক'রতে পারেন। সুকুমার যে আপনাকে মনে মনে কত ভক্তি করে, কত ভালবাসে তা' হয় তো আপনি জানেন না। আপনার মত ঠাকুরদাকে সুকুমারের মত নাতির ভালবাসাটা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। তার এখনকার দুঃখ দুশ্চিন্তার মধ্যেও তার খুব বড় একটা দুঃখ এই যে সে আপনার কাছে থাকতে পারে না। সর্ব্বদাই তার মনে হয় আপনি হয় তো কত কষ্ট পাচ্ছেন আপনার সেবা শুশ্রূষা হয় তো হয় না। এমন দিন যায় না যেদিন সে এই কথা না বলে।

শুধু ভালই বাসে না সে, দেবতার মত দেখে সে আপনাকে। আপনার কথা বলতে তার একখানা মুখ একশোখানা হ'য়ে যায়। আপনার বিদ্যা, আপনার বুদ্ধি ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির কথা ব'লে ব'লে সে শেষ ক'রতে পারে না। সে বলে, "আমি কী মণি—আমার যা কিছু বুদ্ধি, দেশের জন্য চিন্ত" দেশের কাজের প্রেরণা সব তো পেয়েছি আমি দাদুর কাছে। তাঁরই কাছে প্রথম শুনেছি সোস্যালিজমের কথা, তাই না আমি সোস্যালিস্ট!"

তাই ভাবছি, যে কথা আমি ব'লতে পারি না কিছুতেই, সেই কথাটা যদি আপনি তাকে জোর ক'রে বলেন, তবে হয়তো সে তা করতে পারে। তবে হয়তো সেই এই ব্যর্থ জীবনের দারুণ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে দেশের এই দারুণ দুর্দিন অন্য উপায়ে অনেক কিছু ক'রতে পারে, তার যে অশেষ শক্তি এমন ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে তা'দিয়ে দেশকে নির্দেশ দিতে পারে, চালিত ক'রতে পারে উন্নতির পথে।

আপনি যদি দয়া ক'রে তাই করেন তবে আমি বে'চে যাই। সুকুমারের ক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে আমি দিন দিন তুষের আগুনে পুড়ে মরছি। আপনি যদি তাকে এ কথা লেখেন তবে দয়া ক'রে আপনি আমার নামও উল্লেখ ক'রবেন না।

যদি লেখেন তবে চিঠিখানা লিখে আপনি রাখবেন। আপনার কাছ থেকে সে চিঠি আনতে যে লোক যাবে তাকে একখানা পরিচয় পত্র দিয়ে দিলাম। তার হাতে চিঠি দিলে ঠিক পে'ছিবে। ইতি

সেবিকা—

মণিকা।

চিঠিখানা প'ড়ে বুকের ভিতর চেপে ধ'রলাম। দুই চোখ দিয়ে অবিশ্রান্ত জল ঝ'রে প'ড়তে লাগলো।

মণিকাকে আমি চিনি না, কিন্তু হয় তো জানি। সুকুমারের কাছে অনেকগুলি মেয়ে আসতো এবং কখনও বা নির্জ্জনে ব'সে তার সঙ্গে কথা কইতো, কখনও বা তাকে নিয়ে বের হ'য়ে যেতো। মণিকা হয় তো তারই একজন।

এদের আমি দু'চক্ষে দেখতে পারতাম না। আমার ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কার বিংশ শতাব্দীর অর্ধকাল ধ'রে অনেকটা প্রসারিত হ'লেও, আজকালকার মেয়েদের ছেলেদের সঙ্গে এই স্বচ্ছন্দ বিচরণ ও সমাগম আমার চক্ষে ভয়ানক বিসদৃশ লাগতো। আমার স্ত্রী এই সব মেয়েদের সংক্ষেপে ব'লতেন 'বেহুদ্দ বেহায়া'। একদিন একদল যুবক-যুবতীর এ ওর গায় প'ড়ে হাসাহাসি দেখে তিনি ব'লেছিলেন, "ধর্মের ভয় তো নেইই এদের লজ্জাসরমের মাথাও খেয়ে বসে আছে।" বয়ঃপ্রাপ্ত যুবক ও যুবতীর অসঙ্কোচ মেলামেশা যে নির্দোষ হ'তে পারে এ সম্ভাবনাও তাঁর মনে ঠাঁই পেতো না।

আমার অতখানি রাগ হ'ত না। নৈতিক শুচিতা সম্পূর্ণ রক্ষা ক'রেও যে মেয়ে-পুরুষ নিবিড়ভাবে মেলামেশা ক'রতে পারে অসঙ্কোচ হাসি-তামাসা

ক'রতে পারে এ কথা আমার বুদ্ধি ও বিবেচনা স্বীকার ক'রতো। কিন্তু তবু এইসব দৃশ্য দেখলে আমার মনটা আপনি বিষিয়ে উঠতো—আম'দের সমাজের বহু শতাব্দীর সংস্কার সব বুদ্ধি বিবেচনা ভেদ ক'রে ফুটে উঠতো। মোটের উপর আমার ভাবটা ছিল এই যে মেয়ে-পুরুষের নির্দোষ মেলামেশা হয়তো অসম্ভব নয়, তবু, আগুনের আশে পাশে মোমের বেশী ঘোরাফেরা না করাই ভাল।

যখন এই সব বেপরোয়া মেয়েদের সুকুমারের উপর ঝুঁকে প'ড়তে দেখতাম তখন তাই আমার প্রাণের গোড়ায় লাগতো বিষম ধাক্কা। সুবুদ্ধির যুক্তি আর জোর পেতো না, বিপদের শঙ্কায় মন চঞ্চল হ'য়ে উঠতো। ভাবতাম, এরা সুকুমারকে কোন্ পঙ্কে ডোবাবে কে জানে? সুধাকান্তের মতই প্রায় আমার মনে হ'ত এই সব মেয়েদের কমিউনিজমের ওজুহাত শুধু একটা ঢং, এরা আসে শুধু যৌন প্রেরণায়। সুকুমার সুপুরুষ, তার মতামতের রূঢ় নির্মমতার সঙ্গে তার চেহারার কোনও সামঞ্জস্য নেই। পরম কমনীয় ঢল ঢল তার মূর্তি, স্নেহ মাধুর্যের যেন ছবি। তার দেহ শক্তিমান কিন্তু লাবণ্যময়। এ মূর্তি যে ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়েদের লুব্ধ ভ্রমরের মত আকর্ষণ ক'রবে তা' আর বিচিত্র কি? তাই ভারী রাগ হ'ত আমার এদের ওপর, আর শঙ্কা হ'ত না জানি, কবে এরা সুকুমা'রকে এদের পাপ অভিলাষের পঙ্কে ডোবাবে।

কিছু ব'লতে সাহস হ'ত না। যাতে স্পষ্ট কথা বলা যায় এমন সুযোগ এরা কোনও দিনই দেয়নি। কেবল নির্জনে ব'সে গুজু গুজু করা, গায় প'ড়ে হাসি তামাসা করা ছাড়া এদের পরস্পরের ব্যবহারে কোনও সুস্পষ্ট অপরাধের পরিচয় কখনও পাইনি। একদিন কথায় কথায় সাধারণভ'বে মেয়ে-পুরুষদের মেশামিশির আলোচনায় অভিজিৎ আমাকে ব'লেছিল যে, মেয়ে-পুরুষদের একসঙ্গে দেখলে যারা ক্ষেপে ওঠে (আমার কথা তখন ওঠেনি) তারা অতীতের লোক, পথ ভুলে এই শতাব্দীতে এসে প'ড়েছে—এবং তাদের চরম গাল—এদের মনোভাব বুর্জোয়া। ভেবে দে'খছিল'ম কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। আমাদের অতীতের মনটা বর্তমানের সঙ্গে থাপ খায় না।

বলিনি কিছু কিন্তু অস্বস্তি বোধ ক'রেছি যখনি এই মেয়েদের সঙ্গে সুকুমারকে দেখেছি। কিছু বলবার নেই—দিনকালই অমনি প'ড়েছে, ভেবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছি ; সদাই আশঙ্কা ক'রেছি না জানি কখন দুর্ভাগ্য ভেঙ্গে প'ড়বে সুকুমারের উপর—এরা তাকে পাঁকে ডোবাবে।

যে বিপদকে এতদিন ভয় ক'রেছিলাম তা' ঘটে গেছে, মণিকার পত্রে সেই খবর ছিল। সুকুমার ও মণিকা বিবাহ না ক'রেও স্বামী-স্ত্রী ভাবে বাস ক'রছে—পাপে ডুবে রয়েছে। এমন একটা পরিণতি কোনও ভদ্রজীবনে দেখলে চিরদিনই অপরিসীম ঘৃণা বোধ ক'রেছি, ক্রোধের জ্বলন্ত অগ্নিরাশি ঢেলে দিয়েছি এই সব পাপিষ্ঠদের মাথার উপর।

যাকে এত বড় সর্বনাশ ব'লে শঙ্কায় মন কেঁপে উঠতো তাই ঘটেছে সুকুমারের : মণিকা তাকে পাপের ভিতর টেনে নিয়েছে। কিন্তু কোথায় আমার ক্রোধ? কোথায় আমার ঘৃণা?

মণিকার চিঠি পেয়ে, রইলো প'ড়ে সে সব কথা—পড়ে রইলো আমার নীতিনিষ্ঠা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন দ্রোহ।

মনটা আচ্ছন্ন হ'য়ে রইলো এই অনুভূতিতে যে সুকুমারের খবর পাওয়া গেছে—সে কষ্টে আছে কিন্তু মণিকা নির্দেশ ক'রেছে তার কষ্ট থেকে মুক্তি লাভের উপায়। ব্যস্ত হ'য়ে গেলাম তার নির্দেশ পালন ক'রতে। কাগজ কলম নিয়ে ব'সে গেলাম কম্পিত হৃদয়ে সুকুমারকে চিঠি লিখতে।

সুকুমারের কথাই মনটা ভ'রে রইলো ; মণিকার কথা মনেও হ'ল না।

পরের দিন একটি ভদ্রলোক এসে চিঠিখানা নিয়ে গেল। অধীর প্রতীক্ষায় এর পর কয়েকদিন কেটে গেল। প্রতিদিনই ভাবি আজ বুঝি খবর আসবে সুকুমারের—জানবো যে কমিউনিষ্ট পার্টি ছেড়ে দিয়েছে সে। তারপর গভর্ণমেন্ট তাকে আর আটক রাখতে চেষ্টা ক'রবেন না। কেন না, সেক্রেটারী মশায় তো ব'লেইছেন যে, কমিউনিষ্ট পার্টির মেম্বার হওয়া ছাড়া সুকুমারের বিরুদ্ধে আর কোন চার্জ নেই।

(১৩)

দুই সপ্তাহ ব্যর্থ চঞ্চল প্রতীক্ষার পর এলো মণিকার আর এক পত্র। সে লিখেছে,

"দাদু, আপনাকে এ চিঠি লিখতে বুক ফেটে যাচ্ছে। আপনাকে আঘাত দিতে প্রাণ কেঁপে উঠছে।"

আপনার চিঠি পেয়ে সুকুমার কেঁদে ফেলেছিল। আপনাকে সে কষ্ট দিচ্ছে ভেবে তার দুঃখ উথলে উঠেছিল সে দিন।

তারপর তিন দিন সে কোনও কথা বলেনি। তার মনের ভিতর ছিল দারুণ দ্বন্দ্ব, তাই সে কোনও কথা বলেনি।

তারপর সে একদিন ব'ল্লে, "মণিকা, আমি কাপুরুষ!"

আমি চমকে উঠলাম। ব'ল্লাম, "কিসে তুমি কাপুরুষ?"

"কাপুরুষ নই?" ব'ল্লে সে, "আমি যাদের শিক্ষা দিয়েছি কমিউনিজমে, তাদের অনেকে ধরা প'ড়ে জেলে প'চছে। আমি পালিয়ে আত্মরক্ষা ক'রছি! আমার কি উচিত ছিল না তাদের সবার আগে গিয়ে ধরা দিয়ে তাদের সঙ্গে শাস্তি ভাগ ক'রে নেওয়া।"

ভয়ে আমার প্রাণ শুকিয়ে গেল, আমি ক্ষীণকণ্ঠে ব'ল্লাম, "কেন? প্রতাপ সিংহ তাঁর অনুচরদের ফেলে লুকিয়ে আত্মরক্ষা ক'রেছিলেন, সেটা কি তাঁর কাপুরুষতা? তিনি যদি এগিয়ে গিয়ে ধরা দিতেন তাতে কি মেবার বাঁচতো।"

খুব উত্তেজিত হ'য়ে সুকুমার ব'ল্লে, "কিসে আর কিসে! প্রতাপ সিংহ স'রে প'ড়েছিলেন, আবার যুদ্ধের আয়োজন ক'রতে। আমি ক'রছি কী? শুধুই পালিয়ে বেড়াচ্ছি—দেশে-বিদেশে, বনে-জঙ্গলে পালিয়েই বেড়াচ্ছি, তাড়া খাওয়া কুকুরের মত। কোনও বড় কাজের কল্পনাও ক'রতে পারছি না, কাজে হাত দেওয়া তো দূরের কথা, ক'রছি শুধু প্রেম। নিচ্ছি তোমার সেবা। আমি কাপুরুষ!"

আমি শুধু ব'ল্লাম, "নিজেকে মিথ্যা অপমান ক'রছো তুমি।" কেঁদে ফেল্লাম। আর কথা বের হ'ল না।

তারপর একদিন সে আপনার চিঠি বের ক'রে দেখাল আমাকে।

চিঠি পড়া হ'লে সে ব'ল্লে, "আমা'র সামনে এখন আছে মাত্র এই দুটি পথ। হয় দাদুর উপদেশ অনুসারে কমিউনিজম ত্যাগ ক'রে গভর্ণমেন্টের পা' চাটা, না হয় বীরের মত এগিয়ে গিয়ে শাস্তি মাথা পেতে নেওয়া!"

"দাদু তো তোমাকে কারও পা চাটতে বলেননি। ব'লেছেন শুধু তোমাকে ভাল ক'রে বুঝে দেখতে। এই যদি তোমার ধারণা হয় যে এমনি ক'রে পালিয়ে বেড়ান'র চেয়ে এ পথ পরিত্যাগ ক'রে অন্য পথে দেশের সেবা করাই কর্তব্য তবে নির্ভয়ে সে সিদ্ধান্ত স্বীকার ক'রে সেই অনুসারে কাজ করতেই শুধু ব'লেছেন।"

কঠোর হাসি হেসে সে ব'ল্লে, "তা'হলে লোকে কি ব'লবে জান? ব'লবে যে এমন সুবুদ্ধি আমার হ'য়েছে শুধু নির্য্যাতনের ভয়ে, বিবেচনার ফলে নয়।"

আমি ব'ল্লাম, "লোকে কি ব'লবে না বলবে সেইটাই বড় কথা নয়। তোমার অন্তর কি বলে সেইটাই বড় কথা।"

গম্ভীর হ'য়ে ভাবলে কিছুক্ষণ। তারপর সে ব'ল্লে, "লোকের সেবা ক'রতে গেলে, লোকে কি বলে না বলে সে কথা অতটা অগ্রাহ্য করা চলে না। তাদের অগ্রাহ্য ক'রলে তারা আমার কথা শুনবে কেন? আমার পথে আসবে কেন? যদি কেউ না শোনে তবে একলা পড়ে আমি কি করবো।"

আমি তাকে গেয়ে শোনালাম,

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চল রে।"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে ব'ল্লে, "আমি বুঝতে পারছি মণিকা এ জীবনে তোমার ভয়ানক কষ্ট হ'চ্ছে। এ কষ্ট তোমাকে দেবার আমার কোনও অধিকার নেই। তুমি ফিরে যাও।"

এই অপমানে আমি কেঁদে ফেল্লাম। আমি না কি আমার নিজের কষ্টে ব্যাকুল! দাদু আপনার পা ছুঁয়ে বলতে পারি যে এতদিনের মধ্যে কোনও দিন আমার নিজের কষ্টের কথা মনের কোণেও আসেনি। একথা ওকি ভাবতেও পারলে না যে ওর কাছে থাকতে পারা ওর মুখের কথা শুনতে পাওয়াই আমার স্বর্গসুখ?

ব'ল্লাম না সে কথা। মনে হ'ল সে কথা ব'ল্লে ও তাকে নাটুকে ব'লে ঠাট্টা ক'রবে। শুধু ব'ল্লাম, "আমায় এমন অপমান তুমি ক'রলে?"

কথ'টায় ও যেন একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে গেল। খুব মিষ্টি ক'রে আদর ক'রে সে আমায় বোঝাতে চেষ্টা ক'রলে যে আমার ফিরে যাওয়া শুধু আমার নয়, তারও ভাল'র জন্য সবচেয়ে সুযুক্তি।

তারপর কাল সে শোনালে আমাকে মর্মান্তিক কথা। ব'ল্লে স্থির ক'রেছে সে, আত্মসমর্পণ ক'রবে। কমিউনিষ্ট পার্টি ছাড়বে না সে, ছাড়বার কোনও প্রতিশ্রুতি দেবে না।

একবার ব'ল্লাম আমি, "কিন্তু তুমিই তো ব'লছিলে সেদিন যে ভেবেচিন্তে বুঝতে পেরেছ যে দেশের বর্তমান অবস্থায় কমিউনিষ্ট পার্টির বর্তমান কর্মপন্থা আপাততঃ স্থগিত রাখাই দেশের মঙ্গলের জন্য দরকার।"

"সেকথা সত্যি। যদি সে সুযোগ পেতাম তবে পার্টির লোকদের বুঝিয়ে সে কথা ব'লতাম, তাদের সম্মতি আদায় ক'রতাম। কিন্তু তাদের সব ভাসিয়ে দিয়ে শুধু নিজের বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য দলকে অস্বীকার করা হবে নীচ বিশ্বাসঘাতকতার কাজ।"

এই শেষ। কাল আমরা যাচ্ছি থানায়। সেখানে ধরা দিলে পর আমাদের অদৃষ্টে যা' আছে হবে।

আপনাকে দেখবার বড় সাধ ছিল মনে। এ জীবনে তা' হ'য়ে উঠবে না বোধ হয়।"

একেবারে ভেঙে প'ড়লাম আমি চিঠিখানা প'ড়ে। দারুণ শঙ্কায় মন অধীর হ'য়ে উঠলো। সেক্রেটারীর আশ্বাসে এখন আর তত ভরসা হ'ল না।

সুকুমার কমিউনিষ্ট পার্টি ছাড়বে না—কাজেই কী যে হবে ভাবতে ভয়ে ম'রে গেলাম।

আর মণিকা! ভুলে গেলাম যে সে পাপিষ্ঠা, শুধু মনে হ'ল সে আমার সমদুঃখী, ব্যথার ব্যথী! তার কথা মনে হ'য়ে সমবেদনায়, কান্নায় ভ'রে উঠলো আমার অন্তর।

আমার নীতিনিষ্ঠ্য ভুলে গেল আমার হৃদয়কে শাসন করতে।

(১৪)

পরদিন থেকে খবরের কাগজ খুলতে আমার প্রাণ ভয়ে কাঁপতো—তাতে সুকুমারের আত্মসমর্পণের নিদারুণ সংবাদ শুনবা আশঙ্কায়। এক একবার ভাবতাম মন্ত্রী মশায়ের আশ্বাসের কথা—সুকুমারকে তিনি শুধু আটক রাখবেন, শাস্তি দেবেন না, তাতে সুকুমারের ভালই হবে—এতে ক'রে সে আরও কোনও গভীর বিপদের কাজ ক'রতে পারবে না। বিশ্বাস হ'ত কিন্তু তবু ভাবতে প্রাণ কেঁপে উঠতো।

দিনের পর দিন কাগজ দেখে গেলাম—তন্ন তন্ন ক'রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তাম তার সবগুলি পাতা। সেই শঙ্কিত সংবাদ তাতে পেলাম না।

যে খবর এখন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাগজের সবগুলি পৃষ্ঠা ভ'রে রাখে সে আরও ভীষণ—প'ড়তে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে, বুকের ভিতর ওঠে তোলপাড় ক'রে।

বাঙ্গলা দেশে, পূর্ব ও পশ্চিমে, চলেছে এক অবিশ্রান্ত নির্মম নরমেধ, চলেছে অসঙ্কুচিত লুণ্ঠন ও অত্যাচার। হচ্ছে নারীহরণ, শিশুমেধ—যে কথা ভাবতে চিত্ত শিউরে ওঠে সেই সব অকথ্য অত্যাচার ক'রছে সেই মানুষেরা যারা সভ্য ব'লে নিজেদের পরিচয় দেয়, গর্ব করে নিজ নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির। আরও ভয়ানক কথা, এতে লজ্জা বোধ করে যারা তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়—বেশীর ভাগ ক'রছে হিংসার বীভৎস উল্লাস!

পাড়ি, শুনি আর ভাবি। এই কি আমার সেই দেশবাসী যার নাম ক'রে যৌবনে আমিও কত গর্ব ক'রেছি? ভাবি, এরা কি মানুষ?

যুবক যারা কালে ভদ্রে আসে আমার কাছে তারা পরম উল্লাস ও তৃপ্তির সঙ্গে খবর দিয়ে যায় কবে কোন মুসলমান বস্তী একেবারে ভূমিসাৎ হ'য়ে গেছে, কোথায় কোন পল্লীতে শত শত মুসলমান হ'য়ে গেছে শেষ। বরং সত্যটাকে একটু বাড়িয়েই বোধহয় বলে তারা।

লজ্জা হয়, ঘৃণা হয় এদের কথা শুনে। তারাও তেমনি ঘৃণা করে আমায় আমার মুখে প্রতিবাদ শুনে।

ব'সে ব'সে ভাবি আমার অতীত-জীবনের জগতের কথা। ভিক্টোরীয় যুগের মানুষ আমি। দীর্ঘকাল শান্তির ভিতর বাস ক'রেই বোধ হয়, শান্তিটাকেই সভ্যতার অপরিহার্য্য অঙ্গ ব'লে জানতাম অমরা ; যারা শান্তিভঙ্গ ক'রতে চায় তাদের বলতাম বর্বর। আমাদের এ স্বপ্ন কঠিন আঘাত পেয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধে। তার চেয়ে মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছিল দ্বিতীয় সংগ্রামে।

সে সংগ্রামও শেষ হ'য়ে গেছে। কিন্তু শান্তি? কোথায় শান্তি। সারা বিশ্বে চ'লছে অশান্তির অক্লান্ত সাধনা—সংগ্রাম, ধ্বংস, বিপ্লব, অশান্তি, যাকে আমরা বর্বরতা ব'লে জানতাম, আজ তাই যেন হ'য়েছে সবার ধর্ম, সবার সাধনা।

সেই বিষের পূর্ণমাত্রা পান ক'রেছে ভারত। সেই বিষের শেষ ক্রিয়া কি সুরু হ'য়ে গেছে?

লোকের মুখে যা শুনি, খবরের কাগজে যা' পাড়ি তাতে সন্দেহ থাকে না যে আজকের উভয় বাঙ্গলায় অশ্রান্ত চরম অশান্তিই হ'য়ে উঠেছে আদর্শ, হ'য়ে উঠেছে জাতির প্রধান সাধনা।

সুকুমারের এক বন্ধু এসেছিল আমার কাছে সুকুমারের কোনও খবর আছে কি না জানতে। ছোকরা মহা পণ্ডিত, বিশ্বের সাহিত্য-বিজ্ঞানের অনেক খবরই সে রাখে—করে প্রফেসারী।

কথায় কথায় আমি তাকে এই বিষয়ে আমার মনের কথা ব'ল্লাম। ব'ল্লাম,

"আমরা কি ভুলে গেছি, পৃথিবী কি ভুলে গেছে যে শান্তিটাই কত বড় বস্তু, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কত বড় মূল স্তম্ভ?"

ছোকরা হেসে বল্লে, "ও সব ভিক্টোরীয় যুগের নীতি আজ চলে না। আজকের পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে রয়েছে সংগ্রাম, এর মাঝখানে ব'সে শান্তির স্বপ্ন দেখলে আমরা লুপ্ত হ'য়ে যাবো। তাই না রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে ব'লে গেছেন—

"নাগিণীরা চারিদিকে
ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শান্তির ললিত বাণী
শুনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।"

আমি চুপ ক'রে গেলাম। ভাবলাম, হায় কবিবর, বৃথাই তুমি শুনিয়েছিলে জগৎকে তোমার শান্তির বাণী, বৃথাই জাগাতে চেয়েছিলে বিশ্বাত্মবোধ, বিশ্বপ্রীতি। তাই আজ তোমার ক্লিষ্ট অন্তরের এই মর্মান্তিক বেদনার বাণীটুকুই হ'য়ে র'য়েছে এর মত লোকের কাছে তোমার শিক্ষার নিষ্কর্ষ। পণ্ডিত এরা, জানে এরা আজকের সব তত্ত্ব, সব তথ্য—কিন্তু সে হৃদয় কোথায় এদের যার তন্ত্রীতে তোমার বাণী আঘাত করবে?

ছোকরা চলে গেলে আমি ভাবলাম তার কথাটা হয় তো ঠিক। যে জগতে আমার জন্ম, যাতে আমার বৃদ্ধি হ'য়েছিল, কখন যেন সে আমার পায়ের তলা থেকে স'রে গেছে। আজকের জগতের বায়ু আমাকে দেয় না জীবনের উপাদান, এতে আমার নিঃশ্বাস রোধ হয়। আমি এ জগতের কেউ নই। আমার যে জগৎ একদিন ছিল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অব্যাহত উন্নতির সঙ্গে যেখানে ছিল মার্জিত সংস্কৃতি, ছিল সৌভ্রাত্রের, শান্তির, আধ্যাত্মিক গৌরবের উচ্চ আদর্শ—সে শুধু ছিলই, আজ সে নাই। তার এই পরিত্যক্ত অবশিষ্টটুকু প'ড়ে আছে শুধু আজও নষ্ট গৌরবের মৃত প্রতীকের মত।

দিন রাত আমি চরম আলস্যে প'ড়ে থাকি আমার শয্যায়—আর ভাবি।

ভাবতে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে আসে, হাত পা' হ'য়ে যায় অবসন্ন। নড়া চড়া ক'রতে, কথা কইতেও কষ্ট হয় আমার।

এর ভিতর আমার মেজ মেয়ে, অভিজিতের মা এলো একদিন মস্ত একটা সংবাদ নিয়ে।

অভিজিতের খুব ভাল একটা চাকরী হ'য়েছে দিল্লীর সরকারী দপ্তরে।

বিস্মিত হ'য়ে আমি জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "সে কি? তাকে চাকরী দিলে গভর্ণমেন্ট? সে না কম্যুনিষ্ট?"

মেয়ে হেসে ব'ল্লে, "সে ক্ষেপামী তার কেটে গেছে। কয়েকদিন সুকুমারের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে একটু মাথা বিগড়ে গিয়েছিল! ধরপাকড় সুরু হ'তেই সে সব একদম ছেড়ে-ছুড়ে ঘরে ব'সেছে লক্ষ্মী ছেলে হ'য়ে।" বুঝলাম এই লক্ষ্মী ছেলে হওয়ার লজ্জায়ই অভিজিৎ আসেনি নিজে এ খবরটা দিতে।

শুনে খুব খুশী হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু মনের ভিতর খচ্ ক'রে উঠলো। সুকুমার অভিজিৎ কম্যুনিষ্ট দলের বন্ধুর পন্থা ছেড়ে সুখের জীবন লাভ করুক আমার স্নেহ চিরদিনই এ কামনা ক'রেছে। কিন্তু তবু শুধু শাসনের প্রথম নিঃশ্বাসে ভয় পেয়ে অভিজিৎ পলায়ন ক'রেছে এতে অন্তরে গ্লানি বোধ ক'রলাম। সুকুমারের যে কষ্টের কথা মণিকার পত্রে জেনেছি তাতে মনে দুঃখ পেয়েছি, কিন্তু তার চরিত্র-গৌরবে মুগ্ধ হ'য়েছি। তার সে বীরত্বের পাশে অভিজিতের এই চিত্র আমাকে পীড়া দিল।

আজ সুকুমার কে জানে কোথায়?

একলা ব'সে রেডিও শুনছিলাম। হ'চ্ছিল রবীন্দ্রনাথের দেশের সঙ্গীত। প্রথমে যে গানটি হ'ল তাতেই প্রাণ চমকে উঠলো।

গায়িকা তীব্র সুকণ্ঠে গাইল,

"বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমনি শক্তিমান
তুমি কি এমনি শক্তিমান?"
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে
এমন অভিমান—
তোমাদের এমনি অভিমান
চিরদিন টানবে পিছে—
চিরদিন রাখবে নিচে—
এত বল নাই যে তোমার রবে না সেই টান।
শাসনে যতই ঘেরো, আছে বল দুর্বলেরো
হও না যতই বড়ো আছেন ভগবান।
আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নেরে
বোঝা তোর ভারী হ'ল ডুববে তরীখান।

মনে প'ড়লো সে দিনের কথা যে দিন প্রথম এ গান রচনা ক'রে কবি আমাদের শুনিয়েছিলেন। মনে প'ড়লো তারপর আমাদের নেতৃত্বাধীনে ছোকরারা এই গান ও এমনি আরও সব গান গেয়ে পথে পথে প্রোসেশন ক'রে বেড়াত। এই সব গান তাদের মনে কী সাহস কী উদ্দীপনার সঞ্চার ক'রেছিল, যাতে তারা পুলিসের লাঠির আঘাতেও বিচলিত হয়নি।

সেদিন লর্ড কার্জন ক'রেছিলেন বঙ্গভঙ্গ। তারই প্রতিবাদ ক'রেছিলেন কবি এ গানে। সেদিন ঘরে ঘরে লোকের মনে যে তীব্র অনুভূতি ছিল তারই প্রতিধ্বনি ক'রেছিলেন কবি তা'র অমর ভাষার সুমধুর মূর্চ্ছনায়।

সেই গান শুনে আজ আমার জীর্ণ প্রাণে এলো এক পুলকময় আবেশ সেই অতীতের স্মৃতিতে, যেদিন আমি ও আমার মত সহস্র সহস্র লোকের তীব্রতম অনুভূতি ছিল ঠিক এই কথা—বাঙালীর একতা যে বিধির বিধান, একে ভাঙবে এমন শক্তি ইংরেজের নেই।

তার পরেই এলো তীব্র অবসাদ। কোথায় গেল সে বিধির বিধান, কোথায় সে প্রার্থনা—

"বাঙ্গালীর প্রাণ বাঙালীর মন
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।"

কোথায় সে বাঙলা যার অখণ্ড সত্তা রক্ষা ক'রেছিল সে দিনের বাঙালী অশেষ চেষ্টায় অশেষ কষ্ট বরণ ক'রে। আজ সে বাঙলা খণ্ডিত, সেই বাঙালী আজ পূর্ব-বঙ্গে পরদেশী, বাঙ্গালী মুসলমান আজ এদের কাছে চরম শত্রু—বাঙলার খণ্ডিত দেহের উপর প্রেতনৃত্য চ'লছে, হিন্দু মুসলমান পরস্পরের গলা কাটছে—একেবারে ভুলে গেছে যে তারা সবাই সেই এক বাঙালী!

হায় কবি, বিধির অকাট্য বিধান ব'লে তুমি এই বাঙালীর ঐক্যে গর্ব ক'রেছিলে। কোথায় রইলো সে বিধির বিধান? কোন্ দানব সে বিধান খণ্ডন ক'রে অট্টহাস্যে তোমার এ অভিমানকে উপহাস ক'রছে? তোমার সেদিনকার অভিশাপ কি এদেরও ধ্বংস ক'রবে? এদেরও কি "ডুববে তরীখান?"—দুর্বলের সে বল কী হবে? কবে হবে?

সেদিনকার সেই বাঙলা—ভারতের ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে যে তার কীর্তি লিখেছিল—যার বক্ষের রসে পুষ্ট হ'য়েছিল আমার গৌরবময় স্পর্ধিত যৌবন, স্ফুরিত হ'য়েছিল সে যৌবন শত ধারায়—সে বাঙলা আজ নেই, সে আমিও নেই। আবার কি আসবে সেদিন ফিরে, না কি বাঙালীর কবির আজ স্কটের নৈরাশ্যের ভাষায় গাইতে হবে,

But Oh my country's withered state
What second spring shall renovate?

ভাবতে ভাবতে আমি ভয়ানক উত্তেজিত হ'য়ে প'ড়লাম। মনে হ'ল এখনো কি পারি না আমি আমার অতীতের সেই জীবনের পুনরাবৃত্তি ক'রতে। দেহে শক্তি নেই আমার, কিন্তু মনে আছে বল, ভাষায় আছে শক্তি—রবীন্দ্রনাথের

লোকোত্তর শক্তি না থাক, কিছু আছে। পারি না কি আমি তাঁরই মত তীব্র মদিরার স্রোতে দেশকে ভাসিয়ে দিতে উন্মাদনায় উদ্দীপনায় জাগ্রত ক'রে তুলতে পারি না আবার হিংসা-দন্দ্ব-দ্বেষ বিরোধ-ক্লিষ্ট এই বিচ্ছিন্ন নির্জীব জাতকে? অসম্ভব অসম্ভব কল্পনা মাথার ভিতর আগুনের হলকার মত ব'য়ে গেল।

উত্তেজনার বেগে কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম লিখতে। কলমের মুখে আগুন ছুটতে লাগলো। মনে আশা দপ ক'রে জ্বলে উঠলো যে দেশবাসীর কাছে আমার এ আকুল আবেদন ব্যর্থ হবে না। জেগে উঠবে এতে তাদের ভিতরকারের সুপ্ত একাত্মবোধ, এদের প্রস্বাপিত ভারতপ্রীতি ও সদ্বিবেচনা।

চক্ষের দৃষ্টি আমার হ'য়ে গিয়েছিল ক্ষীণ। হাতের শক্তি যে কত ক্ষীণ হ'য়ে গেছে, দুপাতা লিখেই তা অনুভব ক'রলাম। কিন্তু দুর্ধর্ষ প্রতিজ্ঞা নিয়ে লিখে গেলাম সকল অশক্তি জয় করবার প্রচন্ড চেষ্টায়। চার পাঁচ পাতা লেখা হ'লে আর পারলাম না। চোখ ঝাঁপসা হ'য়ে গেল, মাথা বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরে উঠলো।

অবসন্ন হ'য়ে বিছানায় শুয়ে প'ড়লাম।

অবসাদক্লিষ্ট হ'য়ে ভাবতে ভাবতে মনে হ'ল, বৃথা এ চেষ্টা! পারিও যদি লিখতে, কে প'ড়বে সে লেখা? কেমন ক'রে পেঁছুবে আমার বাণী দেশবাসীর অন্তরে? —প্রচার ক'রবে কে? অভিজ্ঞতায় জানি আমি যে, এ বৃদ্ধের লেখা পড়বার জন্য কেউ তো আগ্রহান্বিত হ'য়ে নেই! জানি আজকের দিনে প্রচারের পন্থা ও তার বিরাট ব্যবসায়। সে পন্থায় আমি অভ্যস্ত নই—সে পথে আমার অধিকার নেই। তাই, যত সারবান যত মূল্যবান যত শক্তিমান বা দীপ্তিমান হোক আমার বাণী, মরুভূমিতে ক্রন্দনের মত তার নিঃশ্বাস বিলুপ্ত হ'য়ে যাবে উদাস বাতাসে, কারও কানে তা পেঁছুবেনা। আজকের বিশ্বব্যাপী ব্যস্ততার দিনে, বহুমুখী প্রচারের দিনে, সব কথা পড়বার বা শোনবার অবকাশ লোকের নেই, যোগ্যাযোগ্য বিচার ক'রে পাঠ্য বিষয় চয়ন ক'রে নেবার সুযোগই নেই। সে ভার সবাই তুলে দিয়েছে প্রচার

ব্যবসায়ীদের হাতে। তারা বেছে নেয়, তাদের প্রচার্য্য লেখক, তাদের শতমুখে প্রচার করে, আর তাদের হাততোলা জিনিষ লোকে পড়ে বা শোনে। তাদের কাছে আমার কোনও স্থান নেই আজ।

এই তো আমি! এই আমার শক্তি আজ! তবু মনে আসে এই মস্ত কল্পনা, ক'রতে ইচ্ছা করে অসম্ভব সাধনা!

কিছুই ক'রতে পারি না আমি—বৃথা আমার আকাঙ্খার আস্ফালন।

আমি পারি না, কিন্তু পারতো সুকুমার। সে যদি আমার পাশে থাকতো, যদি পারতাম আমি আমার প্রাণের আগুন তার ভিতর সঞ্চারিত ক'রতে তবে অদম্য শক্তি নিয়ে সে ক'রতো বিজয় যাত্রা! সে পারতো।

কিন্তু হায়! কোথায় সুকুমার।

শুয়ে থাকতে পারলাম না আর। তীব্র জ্বালায় জ্বলে উঠলো অন্তর। উঠে পড়লাম।

তারপর—ব'সলাম গিয়ে বারান্দায় আমার ইজি চেয়ারে।

(১৬)

ব'সে ভাবতে লাগলাম। অতীতের অনেক কথা ভেসে গেল সজীব ছবির মত মনের ভিতরে।

মনে হ'ল সেদিনের কথা, যে দিন মুষ্টিমেয় মহাপ্রাণ ভারতবাসী স্বপ্ন দেখেছিলেন এক অখণ্ড ভারতের, প্রাণের ভিতর জ্বালিয়ে তুলেছিলেন জাতীয়তা ও স্বাধীনতার ক্ষুদ্র প্রদীপ, রক্ষা করেছিলেন তার ক্ষীণ আলোক ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে, দুই হাত দিয়ে, প্রাণের সমস্ত আকুতি নিয়ে। সেদিন ভারত ছিল পরিভূত, পর-পদানত—ছিল সহস্র খণ্ডে খণ্ডিত। সেই পরাধীনতার অন্ধকারে জ্বেলেছিলেন তাঁরা তাদের দীপ, তার দীপ্তিতলে মহাভারতের সহস্রখণ্ড একটী সূত্র দিয়ে গেঁথে তোলবার দুর্ধর্ষ প্রয়াসে।

তাঁদের সে সাধনা নিষ্ফল হয়নি। যে প্রদীপ তাঁরা জ্বেলেছিলেন আশা দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে, তার দীপ্তি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হ'য়ে উঠলো, আরও বহু সাধক লেগে গেল সেবায়।

শেষে এলো এক স্মরণীয় দিন যেদিন বাঙলার বাঙালী, মহারাষ্ট্রের বর্গী, পাঞ্জাবের শিখ ও তামিলনাদের মান্দ্রাজী একত্র সমবেত হ'য়ে প্রতিষ্ঠা ক'রলে জাতীয় কংগ্রেসের।

তখন আমি ষোল বছরের যুবক। তার আগেই বক্তৃতা শুনেছিলাম আমরা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, শুনেছিলাম তাঁর মুখে জ্বালাময়ী ভাষায় ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডীর কথা। সে বক্তৃতায় আমাদের চিত্ত ছিল পরিপূর্ণ। হৃদয়ের প্রতি কন্দরে জেগে উঠেছিল উৎসাহ যে আমরাও একটি ম্যাটসিনির মত প্রচার ক'রবো দেশে দেশে স্বাধীনতার বাণী, গ্যারিবল্ডীর মত খণ্ডিত ভারতকে এক ক'রে চালাব স্বাধীনতার অভিযান। তাই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা আমাদের কাছে হ'য়ে গেল একটা প্রকাণ্ড উৎসাহ ও উদ্দীপনার কেন্দ্র।

আমার বন্ধুদের মধ্যে যারা কংগ্রেস নিয়ে পরিহাস করবার চেষ্টা ক'রতো তাদের আমরা বরদাস্ত ক'রতে পারতাম না।

আমাদের এক বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু একদিন ব'লেছিলেন আমাদের কাছে আমেরিকার স্বাধীনতার সম্পূর্ণ ইতিহাসের কাহিনী। তাঁর কাছে শুনেছিলাম যে, আমেরিকায় কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র ইংরেজ উপনিবেশ, একদিন সংকল্প ক'রলো যে তারা বিচ্ছিন্ন থাকবে না, এক সম্মিলিত রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই তখন বৃটিশ পার্লামেন্টের ও ইংলণ্ডের রাজার অধীন। সে অধীনতায় তখন তাদের আপত্তি ছিল না। তাদের প্রথম কল্পনা ছিল ইংলণ্ডের রাজার অধীনে এই সমবেত রাষ্ট্রপুঞ্জ পাবে বহুলপরিমাণে আত্মকর্তৃত্ব। কনভেনসনের পর কনভেনসন ব'সতে লাগলো, বৃটিশ পার্লামেন্ট তাদের তুচ্ছ ক'রে চালালেন তাঁদের যথেচ্ছ শাসন, তাদের উপর চাপালেন নূতন নূতন কর। এই উপেক্ষাই সেই রাষ্ট্রপুঞ্জকে দৃঢ়বদ্ধ ক'রলো —শেষে এলো বিস্ফোরণ—যুদ্ধ। তার ফলে পরিশেষে প্রতিষ্ঠিত হ'ল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র।

এ ইতিহাস আমাদের অন্তরে রোমাঞ্চ লাগিয়েছিল। আমরা স্বপ্ন দেখতে লাগলাম সেই দূর ভবিষ্যতের যে দিন সেদিনকার সেই ক্ষুদ্র আয়োজন থেকে জন্ম নেবে বিশাল ভারতের স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্র।

দিনে দিনে, আমার জীবনের গতির সঙ্গে সঙ্গে আমার চক্ষের সাম্‌নে আমাদের এই স্বপ্ন উত্তরোত্তর সফলতার দিকে অগ্রসর হ'ল। কংগ্রেস হ'য়ে উঠলো এক বৃহৎ ব্যাপার, সর্বভারতের সকল লোকের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হ'ল তার স্থান।

দিনে দিনে তিলে তিলে প্রতিষ্ঠিত হ'ল সেই মহাভারতের ভিত্তি, গ'ড়ে উঠলো তার মন্দির, জাতীয় আদর্শ হ'ল সুনির্দিষ্ট। হিন্দু মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান সবাই তাদের ভেদাভেদ ভুলে সমবেত হ'ল এই জাতীয় পতাকার মূলে, স্বাধীন ভারতের মহামন্ত্রের উপাসনায়।

শঙ্কিত বৃটিশ শাসক স্তোক দিয়ে, ভ্রূকুটি ক'রে নিষ্পেষণ ক'রে দমন ক'রতে পারলেন না এই জাতীয়তার অগ্রগতি বরং দমনে উগ্র ও শক্তিমান হ'য়ে উঠলো সমগ্র জাতি।

যখন জাতি ও বিজাতীয় শাসকের এই শক্তি পরীক্ষায় আমরা নিত্যই অনুভব ক'রতে লাগলাম আমাদের উপচীয়মান শক্তি, নানা সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হ'তে লাগলাম আম'দের আদর্শ-নির্দ্দিষ্ট পথে, তখন এক তুচ্ছ অবসরে লর্ড কার্জন আমাদের নির্মায়মান মহাসৌধের এক ফাটলে ফেলে দিলেন একটি ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতার বীজ। স্যার ব্যামফাইল্ড ফুলার তাতে জলসেক ক'রে গেলেন, তার অঙ্কুর বৃদ্ধি পেল। ক্রমে একদিন সেদিনের জাতীয়তার প্রধান পুরোহিতেরাই লক্ষ্ণৌ নগরে সেই অঙ্কুর সাড়ম্বরে বরণ ক'রে নিয়ে সাদরে প্রতিষ্ঠিত ক'রলেন জাতীয় মন্দিরের ভিত্তিমূলে।

সেদিনকার সেই বীজ ও অঙ্কুর আমার শঙ্কিত নয়নের সম্মুখে দিনে দিনে বর্ধিত হ'য়ে হ'ল এক বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষ। তার মূল প্রসারিত হ'য়ে গেল মন্দিরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে—শাখা-প্রশাখা বিস্তার ক'রে সেই মহাতরু আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্লে জাতীয়তার সৌধ।

আজ তাই সে মহামন্দির দ্বিখণ্ডিত—হয়তো বা হ'য়ে যাবে চূর্ণবিচূর্ণিত। এখনো যে সেই হিংস্র সর্বধ্বংসী মূল আচ্ছন্ন ক'রে র'য়েছে এ মন্দিরের আষ্টেপৃষ্ঠে।

আমার যৌবনের সে স্বপ্নের এই পরিণতির ধ্যান ক'রে অন্তর ক্লিষ্ট বিধ্বস্ত হ'য়ে যায়!

মনে প'ড়লো বিরাট ভূমিকম্পের মত এই বিষতরুর চরম বিস্ফোরণের দিন—১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাসে—যেদিন মুশ্লিম লীগ সিদ্ধান্ত ক'রলেন প্রত্যক্ষ সংগ্রাম উদ্বোধনের। সেই ভয়ঙ্কর দিনে হঠাৎ শান্তিপূর্ণ ক'লকাতা সহরে লেগে গেল প্রেতের নৃত্য, পল্লীতে পল্লীতে হ'তে লাগলো বীভৎস হত্যালীলা। মানুষ ভুলে গেলো তার মনুষ্যত্ব, হিংস্র পশুর মত রক্তের কর্দমে লাগিয়ে দিলে উল্লাসের নৃত্য।

সেদিন, দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় অন্তর হ'য়ে গিয়েছিল বিষাক্ত, কন্টকিত। কিন্তু আজ যা হ'চ্ছে তার কাছে সেদিনকার ধ্বংসলীলাও তো ছেলেখেলা।

সেদিন সুকুমার আমার কাছে ছিল। মনে প'ড়লো সেদিনকার সুকুমারের বীরকীর্তি। সেই শোণিতপ্রপাতের মাঝে দাঁড়িয়ে সে ছিল ধীরস্থির। অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সে ও তার যুবকদল পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে আয়োজন ক'রলে নাগরিকদের জীবন সম্মান ও সম্পদ রক্ষায়। যাদের হাতে জীবন ও শান্তিরক্ষার ভার সেই পুলিস তখন নিষ্ক্রিয় বা অশক্ত। তাই এরা ভার নিলে প্রতি পল্লীতে যুবকদল গড়ে তুলে আক্রমণের প্রতিরোধ করতে।

তখন, দিনে তার মুখে অন্ন ওঠে নি, রাত্রে সে নিদ্রা যায়নি, কেবলই ঘুরে ঘুরে সে ক'রেছে স্বেচ্ছাসেবক রক্ষীবাহিনী সংগঠন।

সে কয়দিন নগরবাসীদের দিনরাত্রি কাটতো একটা দারুণ নিত্য শঙ্কার ভিতর। আমাদের পাড়ায় কোনও বিশেষ উৎপাত হয়নি, কিন্তু অহোরাত্রি কেটেছে নিদারুণ উৎকণ্ঠায়। ঘন্টায় ঘন্টায় রব উঠতো "ঐ আসছে দাঙ্গাবাজ মুসলমান।" কখনো কখনো বা দূরে দেখা যেত আগুনের জ্যোতি। সবাই চঞ্চল হ'য়ে উৎকণ্ঠাভরে প্রতীক্ষা করতো আক্রমণের। আর আসতো সংবাদ ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের বীভৎস উৎপাতের। তার যতটুকু খাঁটি সত্য তাই লোমহর্ষক। কিন্তু খবর আসতো সত্যের উপর বিস্তর রং ফলিয়ে। আর আসতো দলে দলে পীড়িত আর্ত সর্বহারার দল, বিপন্ন অঞ্চল থেকে আশ্রয়ের জন্য। তাদের মুখের কথা শুনে সর্বক্ষণই অবিচ্ছেদে হৃৎকম্প হতো। মনে হতো, হায়রে, এই কি মানুষ? এই কি আমার দেশবাসী?

এই সব উৎকণ্ঠার উপর আমার উৎকণ্ঠা হতো সুকুমারকে নিয়ে। সে যে কোথায় আছে কোন্ বিপদের মুখে এগিয়ে গেছে সে কথা কল্পনা করতে প্রাণ কেঁপে উঠতো ভয়ানক। কখন সে বাড়ী ফিরবে সেই মুহূর্তের ব্যগ্র প্রতীক্ষায় কাটতো আমার অর্ধেক রাত্রি। অক্ষতদেহে সে যখন ফিরে আসতো, তখন বুকের ওপর থেকে দশমণ বোঝা নেমে যেত।

আমাকে সে এড়িয়ে যেতে চাইতো, হয়তো ভাবতো আমি তাকে নিবৃত্ত

করবার চেষ্টা করবো। হ'ত সেই ইচ্ছে, কিন্তু তার এই বীরের ধর্মে বাধা দিতে মন উঠতো না। কঠোর শাসনে চিত্তকে নিবৃত্ত করতাম। তাকে ডেকে তার মুখে শুনতাম তার সারাদিনের কাজের কথা।

হতাশভাবে দুহাত ছুঁড়ে সে বলতো : "দাদু, কিছুই ক'রতে পারছি না। কেমন করে পারবো? এ যে এক বিচিত্র সংগ্রাম। লাঠি, সড়কি, পেট্রোল, এসিড বাল্‌ব, বন্দুক, রিভলবার প্রভৃতি যা যেখানে পাচ্ছে নিয়ে সব বীরেরা চলেছেন যুদ্ধ করতে :—কাদের সঙ্গে? যারা লড়াই করতে আসছে, লুঠ করতে আসছে কিম্বা যারা সশস্ত্র আততায়ী তাদের সঙ্গে নয়। লড়তে যাচ্ছেন তাদের সঙ্গে, লুঠ করতে, দগ্ধ করতে যাচ্ছেন তাদের সম্পত্তি যারা নিরস্ত্র নিরীহ অসহায় নির্বান্ধব। সশস্ত্র শত্রু কিংবা পুলিশ বা মিলিটারীর সাড়া পেলেই লম্বা দিচ্ছেন। খবর এলো ভবানীপুরে হিন্দুর দল কয়েকজন মুসলমানকে মেরেছে, তাদের ঘরবাড়ী লুট করেছে। অতএব পার্কসার্কাসে বীরের দল প্রতিশোধ নিতে গেলেন সে পাড়ায় সম্পূর্ণ অহিংস্র বৃদ্ধ শিশু আতুর নির্বিশেষে হিন্দুদের উপর। আবার সেই সংবাদ শুনে হিন্দু বীরের দল চললেন কোথায় হিন্দুপাড়ায় কোন মুসলমান ছিট্‌কে পড়েছে তার সন্ধানে, তার রক্তে পথ ভাসিয়ে দেবেন। এদের যেমন সূক্ষ্ম বিচার, তেমনি বিচিত্র লড়াইয়ের পদ্ধতি। আমরা করব কি? গোলমালের খবর শুনে ছুটে গেলাম এক জায়গায়। গিয়ে দেখি অততায়ী সব ফেরার। প'ড়ে আছে শুধু ভস্মস্তূপ, মৃতদেহ ও লুণ্ঠিত গৃহ। কিছুই করতে পারছিনে!"

তবু সে হার মানেনি। তার দলবল নিয়ে চেষ্টা করেছে পল্লীতে পল্লীতে রক্ষাবাহিনী সৃষ্টি ক'রে গৃহস্থকে রক্ষা করতে, আর্ত ও আক্রান্তকে সাহায্য করতে।

এমন অনেক লোককে সে বাড়ীতে এনে আশ্রয় দিত। দীর্ঘকালের জন্য নয়, শুধু যতক্ষণ তাদের নিরাপদ স্থানে পাঠাবার ব্যবস্থা না হতো, ততক্ষণই সে তাদের রাখতো। তাতেই আমার বাড়ীর মেয়েরা সব সন্ত্রস্ত ও ছেলেরা অল্পবিস্তর বিরক্ত হ'তো। সুকুমার সে সব গ্রাহ্য করতো না। কিন্তু যখন

সে একদিন উন্মত্ত জনতার হাত থেকে তিনটি মুসলমানকে বাড়ী নিয়ে এলো, সেদিন আমার ছোট ছেলে প্রবোধ তীব্র প্রতিবাদ করে বল্লে, "এ সব কি হ'চ্ছে? ওসব চ'লবে না। রাস্তা থেকে যত বিপদ কুড়িয়ে এনে বাড়ী ভর্তি করছো তার উপর নিয়ে এসেছো এই শয়তান মুসলমানগুলোকে? দূর করে দাও এদের।"

সুকুমার তার নিজের ঘরে তাদের বন্ধ করে শান্তভাবে বল্লে, "বিপদ আনিনি কাকা, বিপন্নকে এনেছি, এরা নিরীহ দোকানদার, এদের সর্বস্ব লুটপাট হ'য়ে গেছে। এরা পালায় দেখে উন্মত্ত জনতা ছুটেছিল এদের খুন ক'রতে। দুজন মরেছে, এই তিনটীকে আমি কুড়িয়ে এনেছি। আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি শীগ্‌গির এদের নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। খুব চটে প্রবোধ বল্লে, "ও সব হবে না বাপু, শয়তানের বাচ্ছা মুসলমান এনে বাড়ী ভরবে, সে হবে না, দূর করে দাও এদের।"

সুকুমার বল্লে "কোথায় তাড়াব? পথে বের হ'লে কি এরা প্রাণে বাঁচবে?"

"কে বলছে ওদের বাঁচতে? মুসলমান যত মরে ততই তো ভাল— শয়তানের বংশ ওরা। ওরা এমনি কত হিন্দু মেরেছে খবর রাখ?"

একটু হেসে সুকুমার বল্লে, "আপনার চেয়ে বেশী রাখি কাকা। আপনি ঘরে ব'সে আছেন, আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি যে! যারা হিন্দুদের মারছে, সে ওরা নয়। ওরা অন্যলোক। তারাও মুসলমান বটে, কিন্তু তাদের আসল পরিচয় হ'ল 'খুনে', ঠিক হিন্দু খুনেদের মত। তাদের পাপে ওরা মরবে কেন?"

আরো উত্তেজিত হ'য়ে প্রবোধ বল্লে, "ছেঁদো কথা রেখে দাও। এ বাড়ীতে মুসলমান থাকতে পারবে না।"

সুকুমার দৃঢ় কণ্ঠে বল্লে, "আমি ওদের এনেছি। আমাকে না মেরে ফেলে কেউ ওদের বের ক'রতে পারবে না।"

আমি তখন সেখানে এগিয়ে এসে প্রবোধকে ডেকে নিয়ে, গম্ভীরভাবে আদেশ ক'রলাম, "থানায় টেলিফোন করো।" প্রবোধ টেলিফোনে থানাকে

ডাকলে, আমি তাদের ব'ল্লাম, এই তিনটি মুসলমানকে অবিলম্বে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে।

ইতিমধ্যে পাড়ার কয়েকজন উত্তেজিত ছোকরা এসে বল্লে, "এ বাড়ীতে মুসলমান লুকানো আছে, আমরা তাদের চাই।"

কোমর থেকে রিভলবার বের করে সুকুমার বল্লে, "এসো, যার সাহস থাকে, নিয়ে যাও।"

সে সাহস তাদের হলো না, শৌর্য্য প্রকাশ হলো তীব্র গালিগালাজে।

তাদের একটী একটী করে নাম ডেকে সুকুমার বল্লে, "কৈ কোনদিন তো দেখিনি তোমাকে দিনে বা রাতে পাহারা দিতে। যখন ডাকতে গেছি তখন তোমরা এড়িয়ে গেছ। যখন খবর এলো একদল মুসলমান আসছে এ পাড়া আক্রমণ করতে, তখন তোমাদের ঘরবাড়ী রক্ষার ব্যবস্থা কে করেছিল? তোমরা না আমি? বড় যে বীরত্ব ফলাচ্ছ, যাবে যেখানে মুসলমান অত্যাচার করছে সেইখানে তাদের শাস্তি দিতে? চলো না আমার সঙ্গে। পার্কসার্কাসে, রাজাবাজারে, সেইখানে লড়বে, তাদের সঙ্গে। এসো কে আসবে আমার সঙ্গে।"

তার কথা শেষ না হতেই দূরে সাড়া পাওয়া গেল মিলিটারী লরীর— বীরপুঙ্গবেরা তৎক্ষণাৎ চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সেই লরীতে পুলিশ এসে আশ্রিতদের নিয়ে গেল।

সেই সুকুমার! সে যদি আজ কাছে থাকতো!

কী করতো সে? কিছুই হয়তো করতে পারতো না। তবু উভয় বাংলার আজকের এই নির্ম্মম হত্যালীলার মাঝে সে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতো না।

একলা বসে ভাবছিলাম। এমন সময় প্রবোধ আমার কাছে নিয়ে এল তার কোর্টের কয়েকটি উকীলকে। এরা অনেকেই প্রবীণ—সুশিক্ষিত, তা বলাই বাহুল্য। পাকিস্থান গভর্ণমেন্টের সত্য ও কল্পিত, নৃশংস অত্যাচার তাদের বিচলিত ক'রেছে। তাই তাঁরা এসেছেন সেই অত্যাচারের প্রতিবাদে আমার সহায়তা নেবার জন্য। তীব্র ভাষায় সে অত্যাচারের প্রতিবাদ করে ভারত গভর্ণমেন্টের কাছে পাঠাবার জন্য এক আবেদনপত্র লিখে এনেছেন

এ'রা। তাতে এ'রা বলেছেন, ভারতের অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্থানে যুদ্ধযাত্রা করতে হবে। এই আবেদনপত্রে আমাকে তাঁরা স্বাক্ষর করতে বল্লেন।

আমার মনের সমতা তখন ছিল না। আমিও উত্তেজিত হয়েছিলাম। কিন্তু যথাসম্ভব শান্তভাবে আমি তাঁদের বল্লাম, "এ বুড়োকে আপনারা কেন টানছেন?"

"আপনাকে আমরা চাই-ই। আপনার যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি আছে, তাতে আপনার নামে আবেদনের ওজন অনেক বাড়বে।"

একটু হেসে আমি ব'ল্লাম, "আপনারা এতবড় আবিষ্কার করেছেন জেনে সুখী হলাম। কিন্তু বড্ড দেরী হয়ে গেছে। আমার কিছু শক্তি অবশিষ্ট থাকতে এ আবিষ্কার ক'রলে হয়তে কিছু হতো।"

এর পরে যে সব কথাবার্তা হল তাতে শান্তভাব ধীরে ধীরে অপসৃত হয়ে তীব্র উত্তেজনা দেখা দিলে। শেষে আমাকে বলতেই হলো, যে যুদ্ধ বিষয়ে আমি তাঁদের সঙ্গে মোটেই একমত নই। প্রথম কথা, পূর্ব পাকিস্থানের গবর্ণমেন্ট যদি সেখাকোর নাগরিকের উপর অত্যাচার করে তাতে ভারত কেন যুদ্ধ করে অর্থক্ষয়, লোকক্ষয় করবে? আপনারাই তো তাদের পরদেশী করে দিয়েছেন।

একজন বল্লেন, "আমরা ক'রেছি? কুচক্রী বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ও লর্ড মাউন্টব্যাটেন এমন করে ভারতকে ধবংস করবে বলে ভারতকে ভাগ করে দিয়ে গেছে।"

আমি বল্লাম, "তাই নাকি? আপনাদের কংগ্রেস কমিটি ভারত ভাগের যে প্রস্তাব করেছিলেন, আপনাদের হিন্দুমহাসভা ভারত বিভাগের যে দাবী জানিয়েছিলেন সে সব কি লর্ড মাউন্টব্যাটেন লিখে দিয়েছিলেন? আর আপনাদের নেতারা তাঁর অঙ্গুলি সংকেতে নেচেছিলেন?"

আরেক জন বল্লেন, "সে তাঁরা করেছিলেন এইটে হয়ে গেলে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে এই আশায়।"

আমি বল্লাম, "সে আশার কোনও ভিত্তি ছিল কি? কেউ কি বুঝতে

পারেননি হিন্দু মুসলমানের এই ভেদনীতি স্বীকার করে উভয় ভারতে কেবল অশান্তির বীজ বপন করা হবে।"

উত্তর হলো অশান্তি যদি হয়, তবে তা প্রতিরোধ করবার শক্তি ভারতের আছে। সেই শক্তি প্রয়োগ ক'রবার সময় এখন এসেছে। ব'লেছেন পরদেশী গভর্ণমেন্ট যদি তার প্রজার উপর অত্যাচার করে তাতে ভারতের কিছু আসে যায় না। নিশ্চয় আসে যায়। এ যে মনুষ্যত্বের দাবী, বর্বরতার বিরুদ্ধে সভ্যতার অভিযান! এতে প্রত্যেক সভ্য মানবের অধিকার আছে।

আমি বল্লাম, "অবশ্যই আছে। যদি আপনাদের সে জ্ঞান হয়ে থাকে তবে সে অভিযান করুন পূর্ব বাংলায়। ভারত সরকারকে টানবেন না। দলে দলে সেখানে গিয়ে উৎপীড়িতের সহায় হয়ে লড়াই করুন। সেখানকার অত্যাচারিতদের সঙ্ঘবদ্ধ করুন অত্যাচার প্রতিরোধ করতে। আমার যদি শক্তি থাকতো, যেতাম চলে পূর্ব বাংলায়, যেতাম যেখানে অত্যাচার হচ্ছে। সেই অত্যাচারের সঙ্গে সংগ্রাম করতে।"

একটু পরে আমি বল্লাম, "ভেবে দেখেছেন কি যে ভারতের ফৌজ যে মুহূর্তে পূর্ব বাংলায় পদার্পণ করবে সেই মুহূর্তে সে দেশে যে দেড়কোটি হিন্দু অবশিষ্ট আছে, রুষ্ট জনতার হাতে তাদের কি দুর্দশা হবে?"

একজন উত্তর করলেন, "কিছু হবে না তাদের। এরা পালাবার পথ পাবে না, যদি একবার যুদ্ধের নাম শোনে। দশখানা এরোপ্লেন একদিন পূর্ব বাংলার অধিকাংশ ভূমিসাৎ করে দিতে পারবে।"

"পারে যদি, তবে ধ্বংস হবে কারা? শুধু মুসলমান নয়, সেখানে যে হিন্দু আছে তারাও।"

"তাদের খরচের খাতায় লিখে রাখুন, তারা তো গেছেই।"

"তাদেরই যদি খরচের খাতায় লিখলেন তবে যুদ্ধ ক'রবেন কার জন্যে?" ব'ল্লাম আমি।'

কথায় কথায় কথা বেড়ে গেল, উত্তেজনা শান্ত হল না, আরও বেড়ে গেল। শেষে আমি ব'ল্লাম, "থাক ভাই, আমি বৃদ্ধ, অক্ষম। আমার কিছু করবার

শক্তি নেই, তাই কিছু বলবারও অধিকার নেই। আমাকে তোমরা ক্ষমা করো।"

অনেক কষ্টে আমি এদের বিদায় ক'রে আরও অবসন্ন হ'য়ে প'ড়লাম।

ভাবতে লাগলাম কী বীভৎস হিংসা এদের সমস্ত চিত্ত আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে। যে হিংসা ঢাকায়, বরিশালে এবং কলকাতায়, হুগলীতে রক্তস্রোতে প্রবাহিত হ'য়েছে তারই লেলিহান শিখা এদের অন্তর একেবারে আচ্ছন্ন করেছে—তাই এদের বিবেচনা শক্তি বিমূঢ় হ'য়ে গেছে, ক্ষমা, দয়া-দাক্ষিণ্য সব যেন বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। এ কোন্ দানবের লীলা? এরা মূর্খও নয় গুণ্ডাও নয়, শিক্ষিত ভদ্র দায়িত্বশীল নাগরিক। এদের যদি এই মতি হ'য়ে থাকে তবে অশিক্ষিত, সহজে অবিমৃষ্যকারী জনতা না করবে কী?

মনে পড়লো বিশ্বব্যাপী হিংসাযজ্ঞে পীড়িত কবির চিত্ত যেদিন গেয়েছিল,

"হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভ জটিল বন্ধ
*　　　　*　　　　*
ক্রন্দনময় নিখিল ভুবন তাপদহন দীপ্ত
বিষয়-বিষ-বিকার-জীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত
দেশ দেশ পরিল তিলক, রক্ত কলুষ গ্লানি—

তাই করুণা-কাতর চিত্তে কবি আহ্বান করেছিলেন ভগবানকে,—

"নতুন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী
কর ত্রাণ, মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী;
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চিরমধু নিষ্যন্দ,
শান্ত হে মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য,
করুণাঘন ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য।"

হায় কবি, তোমার এ আর্ত আবেদন তো স্পর্শ করেনি দেবতার অন্তর; কোথায় ধ্বনিত হ'ল সেই মঙ্গলশঙ্খ, সেই শুভ সঙ্গীত-রাগ যাতে ধরণীতল ক'রবে কলঙ্কশূন্য?

কোথায় সে করুণাঘন দেবতা যিনি হিংসান্তব্ধ মানুষের রক্তকলুষ গ্লানি নাশ ক'রবেন? আছেন কি সে দেবতা? না কি দেবতার সত্যস্বরূপ তাই, যা উদ্ঘাটিত ক'রেছিলেন অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন ক'রে, যখন তিনি ব'লেছিলেন যে কুরুক্ষেত্রের উভয় পক্ষের বীরগণ—

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালাণি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥
যথা নদীনাং বহবোহম্বুবেগাঃ
সমুদ্র মেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভি বিজ্বলন্তি॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধ বেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধ বেগাঃ॥
লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥

এই কি বিশ্বনিয়ন্তার সত্য স্বরূপ—এই বিশ্বরূপ! অনন্তকালব্যাপী অশ্রান্ত জীবধ্বংসই কি বিশ্বের শাশ্বত ধর্ম্ম? ধ্বংসের প্রয়োজনেই কি শুধু হয় সৃষ্টি? আর মানুষ শুধু মোহবশে ভগবানকে করুণাঘন ব'লে পায় নিষ্ফল তুষ্টি?

মনে হল এই সত্য। স্নেহ দয়া করুণা সকলি মানুষের রচিত মায়া। হিংসা, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব—এই বুঝি বিশ্বের প্রাণ। ভাবতে অন্তর বিষাক্ত হয়ে উঠলো।

এ কথা ভাবতে আমার অন্তর যেন মরুভূমির মত শূন্য উদাস হ'য়ে গেল, বজ্রদীর্ণ আত্মা আমার যেন অগ্নিদাহাবশিষ্ট ভস্মের মত হ'য়ে গেল।

জগৎকে আমি আর কিছুই হয় তো দিয়ে উঠতে পারি নি, কিন্তু দিয়েছি ভালবাসা। অঞ্জলি ভরে' হৃদয়ের সকল সম্পদ উজাড় ক'রে অকৃপণ করে দিয়েছি স্নেহ প্রীতি। মানুষকে ভালবেসেছি, দেশকে ভালবেসেছি, বিশ্বকে ভালবেসেছি। ভালবাসতে কোথাও বাধা অনুভব করি নি, কুণ্ঠা হয় নি। আমার কাছে যে এসেছে তাকে প্রথমেই বরণ ক'রেছি স্নেহ প্রীতি দিয়ে। তার জন্য চেষ্টা করতে হয় নি, সাধনার প্রয়োজন হয় নি—আপনি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে এসেছে অন্তরের পাত্রভরা ভালবাসা।

ভালবেসেই হৃদয় আমার সার্থকতায় ভ'রে উঠেছে, ফলের প্রতীক্ষা না ক'রে। প্রত্যাখ্যানে ব্যথা লেগেছে, যাকে ভালবাসতে চেয়েছি সে যে ধরা দেয় নি তাতে ক্ষোভ হ'য়েছে, কিন্তু তার পরও ভালবেসেই চ'লেছি। কেন না, ভালবাসাই ছিল আমার জীবনের মর্ম আমার সকল কর্মের, সব সার্থকতার কেন্দ্র।

সেই ভালবাসা মায়া! দ্বেষ, জিঘাংসা, মর্মঘাতী সংগ্রাম অবিশ্বাস, এই সবই বিশ্বের সার, এতেই বিশ্বের জীবন, এতেই তার চরম পরিণতি!

আমার সমস্ত জীবন কি তবে এই মিথ্যা মায়ার মন্দিরে কেটে গেল?

বিশ্বের সব বস্তুর মূল্যমান স্থির করেছিলাম ভালবাসার তুলাদণ্ডে—সে সব দরদাম কি তবে ভিত্তিহীন, আমার? ব্রহ্মাণ্ডের চরম বিচারে ওজনে ভারী হবে দ্বেষ দ্বন্দ হিংসা!

ভাবতে দম বন্ধ হ'য়ে এলো। আপনাকে মনে হ'ল নিরালম্ব, একেবারে নিরাশ্রয়। যে মূল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দিলাম তাতে আশ্রয় পেলাম না। বিনষ্ট বঞ্চিত জীবনের জন্য করুণায় ভ'রে গেল সকল সত্তা! সমস্ত বিশ্বকে এক নতুন অশ্রদ্ধার হিংস্র দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম।

উকীলের দল চলে গেলে সেই বারান্দা শূন্য হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার সম্বিতও যেন শূন্য হয়ে গেল। আশে পাশে যা কিছু আছে

তার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কচ্যুত হয়ে আমার চিত্ত বিশ্বের এই কঠোর রূপের কল্পনায় নিবিড় ব্যথায় স্তব্ধ হ'য়ে রইলো।

সম্বিৎ যখন ফিরে এল তখন দেখতে পেলাম আমার পায়ের কাছে বসে আছে একটি নারী—সুন্দরী, যুবতী।

কখন সে এসেছে কোথা হতে এসেছে জানি না। হঠাৎ চমকে বল্লাম "কে তুমি?"

সে নতমুখে ক্ষীণকন্ঠে উত্তর দিলে, "আমি মণিকা।"

(১৭)

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত আমি চমকে উঠে ব'সলাম। ত্রস্তভাবে জিজ্ঞাসা কর'লাম, "তুমি এসেছ!—সুকুমার কোথায়?"

মনে হঠাৎ একটা অসম্ভব আশা হ'ল। ভাবলাম বুঝি কোন দেবতা আমার আজকের আকুল আকাঙ্ক্ষা শুনতে পেয়ে সুকুমারকে আমার পাশে এনে দিয়েছেন। ব্যগ্র প্রতীক্ষায় তাই মণিকার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

অনেকক্ষণ মণিকা শুধু ফুঁপিয়ে কাঁদলো, কথা কইতে পারলো না। তারপর অনেক কষ্টে সে ব'ল্লে, "সে আসেনি।"

হতাশ হ'য়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলাম। তারপর তিক্ত কণ্ঠে তাকে ব'ল্লাম, "তবে তুমিও তাকে ফেলে এলে?"

মণিকা ধীরে ধীরে নতমুখে ব'ল্লে, "আমি তাকে ফেলে আসিনি, সেই আমাকে ফেলে চ'লে গেছে।"

"কোথায় গেছে সে?"

সংক্ষেপে মণিকা ব'ল্লে, "বরিশাল।"

ছোট্ট কথাটা—কিন্তু কী বিভীষিকাময়। শুনেই আমার মাথাটা বোঁ ক'রে ঘুরে গেল।

বরিশাল!!

সেখানকার কত নৃশংস কাহিনী যে রোজ শুনছি! কত হত্যা কত হীন ব্যভীচার অত্যাচার রক্তপাতের সে কাহিনী!

আজ সেখানে যাওয়া মানে প্রায় নিশ্চয় মৃত্যু—সেই মৃত্যুর মুখে চ'লে গেছে সে—আমার কাছে আসেনি!

অনেকক্ষণ কোনও কথাই ভাবতে পারলাম না আমি। অনেকক্ষণ পর একটু সুস্থির হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর'লাম, "আর তুমি?"

আঁচলে মুখ গুঁজে মণিকা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ব'ল্লে, "আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে, তাই সে কিছুতেই আমাকে সঙ্গে নিলে না।"

"হাসপাতালে? কেন? কী হ'য়েছে তোমার?"

কিছুতেই এ কথার উত্তর দিতে পারলে না মণিকা। শেষে সে উঠে দাঁড়াল,—যেন আমার সামনে থেকে স'রে যেতে চায় সে।

তখন তার দেহের দিকে চেয়ে সত্য কথাটা মাথার ভিতর বজ্রের মত আঘাত দিয়ে চমক দিয়ে গেল।

—সে অন্তঃসত্ত্বা, হয়তো মা হবার আর দেরী নেই তার!

মণিকা ব্যাভিচারিণী—পাপিষ্ঠা! তার পাপের, সুকুমারের পাপের শাস্তি সে বহন ক'রছে তার গর্ভে!

তাই কি তাকে তাড়িয়ে দিলাম? এমন চিন্তা মনেও এলো না আমার। তার দীন কাতর মূর্তির দিকে চেয়ে শুধু করুণায় চিত্ত ভ'রে গেল। একটি কথাই শুধু আমার মনে হ'ল, "একে নিয়ে কী করি এখন? এই যে সর্বনাশ ক'রে বসেছে এরা, তার পরিণাম থেকে কি ক'রে একে রক্ষা করি?"

তার প্রতি স্নেহ ও করুণায় চিত্ত ভ'রে উঠলো। যে সত্য জীবনে বার বার উপলব্ধি ক'রেছি তাই আবার অনুভব ক'রলাম। স্নেহ প্রীতি করুণার উচ্ছ্বসিত প্রবাহ, নীতি ধর্মের কঠিন নিগড়ের বাধা ছেলায় চূর্ণ ক'রে ব'য়ে যায়!

মণিকার চিঠি দু'খানা যদি না আসতো তার সমস্ত হৃদয়ের যে চিত্র তার

ভিতর নিঃশেষে ফুটে উঠেছিল তার পরিচয় যদি আমি না পেতাম আর এমনি বিপন্ন পরিত্যক্ত অবস্থায় যদি সে না আসতো আমার কাছে, তবে হয় তো আমি অসঙ্কোচে তাকে পাপিষ্ঠা ব'লে বিদায় ক'রতে পারতাম।

এখন আর সে কথা মনেও এলো না। মণিকা তার স্নেহের আঘাতে আমার হৃদয়ের দ্বার একেবারে উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছিল—সেখান থেকে তীব্র বেগে বাহির হ'ল শুধু প্রীতির প্রবাহ। শুধু ভাবলাম, একে নিয়ে কী ক'রতে পারি?

ভেবে কূল পেলাম না। চিন্তার সূত্র কল্পনায় প্রসারিত হ'য়ে গেল বহুদূরে। শিশু জন্মাবে—সুকুমারের সন্তান সে, তবু সে জন্মাবে একটা অপরিসীম লজ্জার বোঝা নিয়ে। তাকে নিয়ে আমি কী ক'রবো? কেমন ক'রে সে মানুষ হবে?

সুকুমার—সে কী আর বেঁচে ফিরে আসবে?

সে আশা হ'ল না। তার এ পাপের বোঝা মণিকা যাতে বহন ক'রতে পারে, আমার সংক্ষিপ্ত পরমায়ুর মধ্যে আমি তার কী ব্যবস্থা করতে পারি? এমনি সব রাশি রাশি চিন্তা আমার মাথার ভিতর তোলপাড় ক'রতে লাগলো। ভেবে থই পেলাম না।

দীনতার মূর্ত প্রতীকের মত মণিকা নত নেত্রে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইলো।

অনেকক্ষণ আমার কথার প্রতীক্ষায় থেকে সে এক পা' দু' পা ক'রে সরে যেতে লাগলো।

হঠাৎ যেন আমার চমক ভাঙ্গলো। ব'ল্লাম, "যেও না, দাঁড়াও তুমি।"

(১৮)

সংক্ষেপে তার কাহিনী শুনলাম।

পরে আমার কাছ থেকে হাঁসপাতালে গিয়েই মণিকা আমাকে একখানা চিঠি ও তার সংগে একটা মোটা পুলিন্দা পাঠিয়েছিল। চিঠিতে সে লিখেছিল, "দাদু,

আপনার নাতি আজ বেঁচে আছে কি না জানি না। সে বেঁচে ফিরে আসবার সম্ভবনা আছে তাও মনে ক'রতে ভরসা হয় না।

"আমারও কেবলি মনে হ'চ্ছে আমি হয়তো বাঁচবো না।"

"তাকে অনেকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। আমাদের অভাবে তাঁর স্মৃতি হয়তো কলঙ্কিত হ'য়ে যাবে আমার কথা নিয়ে। যারা তাকে ভালবাসে শ্রদ্ধা করে তাদের অবগতির জন্য আমাদের এই কয়মাসের জীবনের বিস্তৃত সত্য বিবরণ লিখে রেখেছি। আপনি তাকে ভালবাসেন, তাই আপনার কাছে সে কাহিনীটি পাঠিয়ে দিলাম। আপনি দয়া ক'রে এটা রক্ষা ক'রবেন, আর যদি আপনার নাতি না ফেরে, তবে এ বিবরণ প্রকাশ ক'রবেন।

"আমার আশা আছে যে যারা এ কাহিনী প'ড়বে তারা বুঝতে পারবে যে আমি পাপিষ্ঠা হ'তে পারি, কিন্তু সে যে আমাকে তার অন্তরে নিয়ে আশ্রয় দিয়েছিল সেটা তার মহানুভবতা, তার অপরাধ নয়।"

সেই বিস্তৃত কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ;

মণিকা বি.এ. পরীক্ষা পাশ করবার পরই দেশের কাজ করবার ব্যাকুলতায় কমিউনিষ্ট দলের আওতায় এসে প'ড়লো। সুকুমারের সঙ্গে এই সূত্রে হ'ল পরিচয়। সুকুমারের ব্যক্তিত্ব তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেললো।

মণিকা হ'য়ে প'ড়লো সুকুমারের অনুগত ভক্ত। তার বিন্দুমাত্র ইঙ্গিত তার জীবন নিয়মিত করে, তার আদেশে সে জীবন পণ ক'রতে পারে এই হ'ল তার অবস্থা।

সুকুমার যেখানে যায়, যে সভায় সে বক্তৃতা করে সেখানে মণিকার যাওয়াই

চাই। তার জন্য কলেজ পালান ছার, বাড়ী ছাড়তেও সে কুণ্ঠিত হয় না। সহরের বাইরে বহুদূরেও সে যায়, দু'দিন তিন দিন বিনা খবরে বাহিরে ঘুরে বেড়ায়, বাড়ী ফিরে তার বাপ ঠাকুরদার কাছে তার দুর্গতির অন্ত থাকে না. তবু সে যায়।

যে সভা ভাঙতে গিয়ে সুকুমার পুলিসের গুলিতে জখম হ'ল, সে সভায় মণিকা হাজির হ'য়েছিল সবার আগে, ঠিক সুকুমারের পায়ের কাছে জায়গা পাবার জন্য। তার পর যখন সুকুমার এসে পৌঁছুল সে তার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত অগ্রসর হ'য়ে গেল—তার পাশ ঘেঁসে বসবার একটু স্থান ক'রে নিলে।

কাঁদুনে গ্যাস ছাড়তে যখন সভা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে গেল তখন সে সুকুমারের সঙ্গে উঠে তার পিছু পিছু চললো।

তারপর চললো গুলি। সুকুমার আহত হ'য়ে ঢলে প'ড়লে মণিকার উপর।

এই ঘটনার কথা নিয়ে মণিকা লিখেছে। "কি ব'লবো দাদু? সেই মুহূর্তে আমার চোখে পৃথিবী একেবারে অন্ধকার হ'য়ে গেলো। সে ম'রে যাবে মনে হ'তে সর্বাঙ্গ অসাড় হ'য়ে গেল। প্রাণ-পণ ক'রে তাকে বুকের ভিতর চেপে ধ'রে রইলাম ; বোকার মত মানে মনে ব'ল্লাম, ওকে ছাড়বো না আমি কিছুতেই। যেন আমার ছাড়া না ছাড়ায় কিছু আসে যায়। এতদিন সে ছিল আমার গুরু আমার দেবতা—তার বেশী কিছু নয়। এই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে সে হ'য়ে গেল আমার প্রিয়তম, আমার সর্বস্ব!"

শিষ্যার পদবী থেকে লাফিয়ে মণিকা প্রিয়ার পদবীতে আরোহণ ক'রলো।

যখন সে দেখলে যে সুকুমার মরে নি, সে চোখ মেলে মণিকার দিকে চেয়ে ব'ললে, "চলো পালাই", তখন মণিকার অন্তরে যেন বিদ্যুতের রোশনাই জ্বলে উঠলো ; কোথা হ'তে এলো সাত হস্তিনীর বল তার বাহুতে। সে সুকুমারের বলিষ্ঠ দেহের অনেকটা ভার নিজের উপর নিয়ে তাকে এক রকম তোল্লা ক'রে ঢুকলো পাশের একটা গলির ভিতর। সেখানে তাদের এক ডাক্তার বন্ধুর বাড়ী তার বাড়ীতে ঢুকে সে দুয়ার বন্ধ ক'রে দিলে।

ডাক্তার দেখে শুনে যখন আশ্বাস দিলেন কোনও ভয় নেই, মারাত্মক কোনও আঘাত হয় নি তখন মণিকার অন্তর উল্লাসে নেচে উঠলো ডাক্তার তার আঘাতের আশু শুশ্রূষা ক'রে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে শুইয়ে দিলেন। মণিকা সেই বিছানার পাশে ব'সে ঝুঁকে প'ড়ে সুধু সুকুমারের মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

তার শুকনো মুখের দিকে চেয়ে সুকুমার একটু হেসে ব'ল্লে. "বড় ভয় পেয়েছিলে মণিকা, কেমন?"

তার হাত বাড়িয়ে মণিকার একখানা হাত টেনে সুকুমার বুকের উপর রাখলে।

মণিকা কথা ব'লবে কি? উল্লাসে তার বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড আস্ফালন সুরু ক'রলো, লজ্জারক্ত মুখে ফুটে উঠলো রঙিন হাসি।

যে ডাক্তারের বাড়ী আমার বাড়ী থেকে খুব বেশী দূর নয়। বেশ খানিকটা রাত্রি হ'লে অভিজিৎ আর তার দলের দু'একজন লোক নিঃশব্দে সুকুমারকে ব'য়ে নিয়ে এলো আমার বাড়ীতে। মণিকাও সঙ্গে এলো।

আমি যখন তাদের সাড়া পেয়ে নীচে গেলাম তখন মণিকা ভয়ে জড়সড় হ'য়ে খাটের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার ভয়ের চেয়ে এখন আমার কাছে ধরা পড়বার ভয়টাই হ'ল বেশী। প্রেমোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরে এসেছিল লজ্জা ও জুগুপ্সা। এ ব্যাপারটা আমার কাছে পাছে ধরা প'ড়ে যায়, সেই ভয়!

আমি উপরে চ'লে যাবার অনেকক্ষণ পরে এলো সুকুমারের এক বন্ধু। সে পুলিসে চাকরী করে আর এদের কাছে পুলিসের গোপন খবর সরবরাহ করে। সে জানালে যে খুব তোড় জোড় হ'চ্ছে শেষ রাত্রিতে ক'লকাতার সর্বত্র কমিউনিষ্টদের বাড়ী চড়াও ক'রে খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তার করবার।

সুকুমার ব'ল্লে, "সবাই গা ঢাকা দেও।"

মণিকা কম্পিত কণ্ঠে ব'ল্লে, "আর আপনি?"

"আমার ভাবনা আমায় ক'রতে দেও তোমরা পালাও।"

মণিকা মাথা নীচু ক'রে রইলো, তার পর ব'ল্লে, "আমি আপনাকে ফেলে যাবো না।"

তার পর সবাই মিলে পরামর্শ ক'রতে ব'সলো। সুচরিতার কথায় স্থির হ'লো পাটনায় যেতে হবে। ট্রেণে যেতে ভয় আছে, কিন্তু ঠিক এখনি যদি মোটরে যাত্রা করা যায় তবে পুলিসের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব।

তখন অভিজিৎ বের হ'য়ে গিয়ে একজনের গাড়ী নিয়ে এলো। সুকুমারকে তুলে নিয়ে তারা গাড়ীতে বসালে।

মণিকা অনেকক্ষণ দ্বিধা ক'রে চুপ ক'রে ছিল, শেষে সে খপ ক'রে ব'লে ব'সলে, "আমাকে নিয়ে চলুন।"

তর্কের সময় ছিল না, সুকুমার ব'ল্লে "চল"।

অভিজিৎ ও তার এক বন্ধু গাড়ী চালাবার ভার নিলে, মণিকা সুকুমারকে আগলে ব'সে রইলো পিছনের আসনে। সুচরিতা সঞ্চরিতাকে নিয়ে ভোরের বেলায় চ'লে গেল রেল পথে।

পাটনায় সুচরিতার বাড়ীতে সুকুমার ও মণিকাকে নামিয়ে দিয়ে অভিজিৎ ও তার বন্ধু ফিরে এলো।

সুচরিতার স্বামী অমিতাভ ডাক্তার। সুকুমার যখন এলো তখন সে তাকে দেখেই ব'ল্লে, "কিরে? কোথায় গুণ্ডামী ক'রে পালিয়ে এসেছিস?"

অমিতাভ বিচক্ষণ ডাক্তার; চোখা চোখা কথা বলা তার অভ্যাস। রাশভারি লোক, তার কঠোরতাকে সবাই ভয় করে। সুকুমার ফস্ ক'রে তাঁর কথার জবাব না দিয়ে সধু একটু হাসলে।

ডাক্তার চট পট তাকে শুইয়ে ফেলে তার ব্যাণ্ডেজ খুলে ক্ষতগুলি পরীক্ষা ক'রে ব'ল্লেন, "হুঁঃ! সুধু এই টুকু! গুলির ঘা বোধ হচ্ছে। কেমন?"

তখন সুকুমার ব'লতে বাধ্য হ'ল যে সে একটা সভায় বক্তৃতা ক'রছিল, পুলিস খামখা এসে গুলি চালিয়েছে।

"হুঁ—ব্যাটারা তো ওই ক'রতেই আছে।" ব'লে অমিতাভ আঘাত ড্রেস ক'রতে আরম্ভ ক'রলে। পুলিসের প্রতি অমিতাভ চিরকালই জাতক্রোধ!

সুচরিতা তখনই এসে পৌঁছুল। এরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। খামখেয়ালী রোখা পিসেমশায় কি ভবে তাদের অভ্যর্থনা ক'রবেন, তাঁর কাছে তারা নিরাপদ আশ্রয় পাবে কি না, এবিষয়ে সুকুমারের মনে কিছু সন্দেহ ছিল। কিন্তু সুচরিতা এসে সমস্ত ভার নিতে সে নিশ্চিত হ'ল। কেন না তার জানা ছিল যে পিশেমশায়ের খামখেয়ালীর অমোঘ ঔষধ সুচরিতা।

তেতলার একটা নিভৃত ঘরে সুচরিতা সুকুমারের স্থান ক'রে দিলে। চাকর বাকরের তার কাছে যাতে আসতে না হয় সে জন্য তার দেখা শোনার সম্পূর্ণ ভার দিলে সে সঞ্চরিতাকে। সঞ্চরিতার ঘরে মণিকার থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিলে।

আহার শয়ন চিকিৎসা শুশ্রূষা বিশ্রাম সব বিষয়েই চরম সুব্যবস্থা হ'লে; কিন্তু এ ব্যবস্থায় মণিকার প্রাণ ছট্ ফট্ ক'রতে লাগলো। তার তৃষিত অন্তর সর্বদা তাকে ছুটিয়ে নিতে চায় সুকুমারের কাছে, কিন্তু সে যেতে পারে না সর্বদা। তার কাছে যেতে তার মানা ছিল না, সঞ্চরিতার সঙ্গে সর্বদাই সে সুকুমারের ঘরে যায় আসে, কথাবার্তা কয়। কিন্তু তাতে তার মন ভরে না। অথচ তার মনের তলায় এখন যে গোপন ফল্গুর প্রবাহ দিন রাত তার চিত্ত আলোড়িত ক'রছে, পাছে তা' ধরা প'ড়ে যায় সে ভয়ে সে অস্থির।

তাই সুযোগ পেলেই সে সঞ্চরিতাকে এড়িয়ে গোপনে যেতে লাগলো সুকুমারের ঘরে।

সাত দিনের মধ্যেই সুকুমার সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে মণিকারও সাহস বেড়ে গেল। সুচরিতা সংসারের ঝঞ্ঝাট নিয়ে সারাদিন এবং অনেকটা রাত নীচে প'ড়ে থাকে। চঞ্চলা সঞ্চরিতা দিন রাত ব'সে বড়দায় পাহারা দেওয়ার কোনও আবশ্যকতা বোধ করে না। বাড়ীর অন্য লোক সবাই যে যার ধান্ধায় ব্যস্ত। কাজেই মণিকা দিনের এবং রাত্রের অনেকটা সময়ই সুকুমারের নিভৃত ঘরে কাটাতে আরম্ভ ক'রলে।

অবশেষে একদিন রাত্রে বাইরে থেকে ফিরে এসে অমিতাভ কী প্রয়োজনে হঠাৎ সুকুমারের ঘরে এসে প'ড়লো। মণিকা ও সুকুমার তখন পরস্পরের

মুখে মুখ দিয়ে আলিঙ্গন বদ্ধ, অমিতাভের সান্নিধ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন।

তাদের চমক ভাঙলো, অমিতাভের ক্রুদ্ধ উচ্চ কণ্ঠস্বরে।

অমিতাভ সে ঘরের বাইরে এসে বারান্দা থেকে চীৎকার ক'রে সঞ্চরিতাকে ডেকে বল্লে "তোর মাকে পাঠিয়ে দে।"

চমকে উঠে, ভয়ে কাঠ হ'য়ে মণিকা ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে রইলো। সুকুমার উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠলো।

বিপদ বুঝে সুচরিতা ফট্ করে স্বামীর কাছে গেল। তাকে দেখেই অমিতাভ চীৎকার ক'রে ব'ল্লে, "দেখ গে তোমার গুণের ভাইপোর কীর্ত্তি। এ কী পাপ টেনে এনেছ বাড়ীতে? আর এইটেকে জুটিয়ে দিয়েছ তোমার মেয়ের সঙ্গে।—বিদায় কর, বিদায় কর এদের —এক্ষুণি।"

সুচরিতা বল্লে, "আচ্ছা ক'রছি বিদায়, তুমি ঠান্ডা হও। চেঁচামেচি ক'রে বিপদ বাড়িও না। চল নীচে চল।"

অমিতাভের কথা শুনে মণিকা ভেঙ্গে পড়লো। অপরিসীম লজ্জায় সে অভিভূত হ'ল। নিজের উপর ঘৃণা হ'ল।—এত লেখাপড়া শিখে সম্মানিত ভদ্র পরিবারের মেয়ে হ'য়ে এ কী সে ক'রলে? লোকের কাছে মুখ দেখাবার পথ রইলো না তার। মস্ত বড় আদর্শ নিয়ে দেশের সেবা ক'রতে সে নেমেছে, সে কিনা একটা যে কোনও তুচ্ছ নারীর মত তার সব মান সম্মান, তার নারীত্বের প্রধান গৌরব মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় বিলিয়ে দিলে?

আরও তীব্র অনুশোচনা হ'ল তার এই ভেবে যে হয় তো সে তার অন্ধ প্রবৃত্তি নিরোধ না ক'রে সর্বনাশ ক'রে বসেছে সুকুমারের। এখানে সুকুমারের ছিল একটা নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়, সে আশ্রয় ধবংশ ক'রে দিলে সে তার অবিমৃশ্যকারিতায়। এ বাড়ী থেকে তাকে বের ক'রে দিলে সে কোথায় এমন আশ্রয় পাবে? হয় তো এখনি সে পুলিসের হাতে ধরা প'ড়বে। ধরা প'ড়লে কে জানে তার কি বিপদ হবে?

সুকুমারের সেবা, সুকুমারের মঙ্গল করবার জন্য সে ঘর ছেড়ে তার সঙ্গে

এসেছে মণিকা এই বুঝিয়ে সে অপরিসীম গর্ব বো ধ করেছিল। হায়, কী সেবা, কি মঙ্গলই সে তার ক'রলে? তার চেয়ে সুকুমার যদি একলা চ'লে আসতো পিসিমার আশ্রয়ে তবে কোনও অমঙ্গল তো তার হ'তে পারতো না।

ঘরের এক কোণায় মেঝেয় প্রায় মিলিয়ে গিয়ে হাঁটুতে মাথা গুঁজে সে কেবল ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলো। নিজের যে সর্বনাশ ক'রেছে সে, সে কথা ভেবে নয়, সুকুমারের অনিষ্টের হেতু হ'য়েছে ভেবে।

সুকুমার কিছুক্ষণ মাথা গুঁজে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে ভাবলে। তারও মনে অনুশোচনার অবধি ছিল না। আমার চিরাচরিত শুচিতা ও সুনীতির আদর্শে সে যৌবন কাল পর্যন্ত মানুষ হ'য়েছে, এত দিন তার চরিত্রের দৃঢ়তার প্রাচীরে কোনও ফাটল দেখা যায় নি। আজ এ কী ক'রে ব'সেছে সে?

এ কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে সে আমার কাছে মুখ দেখাতে পারবে না, এই হ'ল তার প্রধান ক্ষোভ। অপরাধের শেষ ধাপে তখনো সে পা দেয় নি সত্য, কিন্তু অন্তরে অন্তরে তার অপরাধের কোনও এুটি তো নেই! আর এই কলঙ্ক এই লোক জানাজানির পর সে ঠিক কতখানি অপরাধ ক'রেছে তার সুক্ষ্ম বিচার কে ক'রতে বসবে?

তা' ছাড়া সে যে তার চেয়েও বেশী সর্বনাশ ক'রে ব'সেছে মণিকার! শিষ্যা হ'য়ে সে এসেছিল তার কাছে। সদ্‌গুরুর মতই সে তাকে বরণ ক'রেছিল, কিন্তু হঠাৎ এ কী মতিভ্রম হোল তার যে তার সমস্ত জীবন সে একটা অভিশাপে ভ'রে দিল, কলঙ্কের পঙ্কে তাকে ডুবিয়ে দিলে। এখন এখান থেকে বিদায় হ'লে সে নিজে হয় তো পুলিসের হাতে প'ড়বে। সে চিন্তায় সে ব্যাকুল হ'ল না, কেবল ভাবতে লাগলো মণিকার কী উপায় হবে? কোথায় সে আশ্রয় পাবে?

মণিকার প্রায় ভুলুণ্ঠিত মুর্ত্তির দিকে চেয়ে করুণায় চিত্ত ভরে উঠলো, বিষের খোঁচায় তার মন জর্জর হ'য়ে উঠলো।

মন স্থির ক'রে সে দাঁড়িয়ে উঠলো, মণিকার কাছে গিয়ে তার হাত ধরে

স্নিগ্ধকণ্ঠে ব'ল্লে, "মণিকা, ওঠ। বিপদের সময় অস্থির হ'লে কোনও লাভ হবে না। ওঠ, চল আমরা এখনি পালাই।"

অশ্রু প্লাবিত মুখে সুকুমারের দিকে চেয়ে মণিকা ব'ল্লে, "আবার তুমি আমার কাছে আসছো? আমি তোমার এত বড় সর্বনাশ ক'রেছি, তবু আমায় ডাকছো।—ছেড়ে দেও, আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তুমি চ'লে যাও।"

দৃঢ়কণ্ঠে সুকুমার ব'ল্লে, "সে হয় না মণিকা। এখন তুমি আমার অত্যাজ্যা। সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে হয় তো আমার লড়তে হবে। যদি হয়, তাও লড়বো তোমার মান রক্ষার জন্যে। অপরাধ ক'রেছি আমি। তোমাকে আইনানুযায়ে বিয়ে ক'রে তোমার সম্মান ফিরে দেবার শক্তি এখন আমার নেই, কেন না, আমি ফেরারী। কিন্তু এসো, আমার হাতে হাত দিয়ে এসো আমরা ভগবান স্মরণ ক'রে প্রতিজ্ঞা করি যে ধর্মের চক্ষে আজ থেকে আমরা স্বামী স্ত্রী, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে, ব্রতে কর্মে আমরা হব সহচারী সহকর্মী—স্বামী স্ত্রী। এর পর যদি দিন পাই, আইনের ঋণ শোধ ক'রে দেব আমি, আইনের চক্ষে, সমাজের চক্ষে, বৈধ ক'রে নেব আমাদের সম্বন্ধ কিন্তু এসো, প্রতিজ্ঞা কর, ধর্মের জগতে আজ থেকে আমরা স্বামী স্ত্রী।"

—এ কথা লিখতে সে অন্তরে যে উল্লাস ও গর্ব অনুভব ক'রছিল তা' তার কলমের মুখে ফুটে উঠেছিল।

"আপনি তো জানেন না দাদু আপনার নাতির বক্তৃতার কী সম্মোহিনী শক্তি আছে। আমি দেখেছি, সভাশুদ্ধ লোককে তার বক্তৃতার ছন্দে ছন্দে অপূর্ব উত্তেজনায় মেতে উঠতে। আর আমি, আমার তো কোনও জ্ঞানই থাকে না তার বক্তৃতা শুনলে। যখন সে এই কথা ব'ল্লে তখন আমার মনের সব গ্লানি যেন হঠাৎ নিঃশেষে ঝরে' প'ড়ে গেল, অপূর্ব আনন্দ আর উত্তেজনায় অধীর হ'য়ে প'ড়লাম।"

"আমি কান্না ভুলে গেলাম, লাফিয়েই উঠে প'ড়লাম। তার হাতে হাত দিয়ে তার কথা মত প্রতিজ্ঞা ক'রলাম, আর মনে আমার কোনও দুঃখই রইলো না।"

তার পর সুকুমার ব'ল্লে, "চল এখনি আমরা পালাই, কোনও হাঙ্গামা হাল্লা হবার আগে।"

অসঙ্কোচে নির্বিবাদে তার হাত ধ'রে রাত্রির অন্ধকারে আত্মগোপন ক'রে খিড়কীর দরজা দিয়ে মণিকা বেরিয়ে প'ড়লো নিরুদ্দেশ যাত্রায়। সহরের রাজপথ পার হ'য়ে যখন সম্পূর্ণ নির্জন পথে তারা প'ড়লো তখন মণিকা জিজ্ঞাসা ক'রলে, "এখন কোথায় যাবে?"

হেসে সুকুমার ব'ল্লে, "তা জানি না তো! যেতে যেতে যেখানে পৌঁছুবো সেইখানেই যাব। হয় তো সেটা জেলখানাও হ'তে পারে।"

তার পর তাকে বুকের ভিতর টেনে নিয়ে আদর ক'রে সুকুমার ব'ল্লে, "ভয় হচ্ছে তোমার?"

ভয় তার খুবই হচ্ছিল, কিন্তু সুকুমারের পাশে ব'সে সে ব'লবে, ভয় ক'রছে? কিছুতেই না। সে ব'ল্লে, "না, কোনও ভয় নেই।"

"ঠিক কথা, এই তো চাই," মণিকার পিঠ চাপড়ে ব'ল্লে সুকুমার, "ভয়টা যে কত বড় মায়া সে আমরা বুঝতে পারি না। কিসের ভয়? মরার চেয়ে ভয়ানক কিছুই নেই, কিন্তু মরতে তো হবেই সবাইকে, ভয় ক'রে তাকে ঠেকিয়ে রাখতে তো পারবে না। তেমনি সব বিপদ। এলে পরে তার সঙ্গে লড়তে হবে, জিততে পার ভাল কথা, না পার, যা হবার হবেই, তাকে ভয় ক'রে কি উপকার হবে?"

মণিকা ব'লেছিল, সুকুমারের কথার একটা সম্মোহিনী শক্তি আছে। তাই এমনি একটা সাধারণ শুকনো দার্শনিক তত্ত্বও তার মুখে যখন বের হ'ল, তাতে মণিকার অন্তরের শঙ্কা ও গ্লানি দূর ক'রে তাতে এক স্নিগ্ধ প্রলেপ লাগিয়ে দিলে দুর্দম সাহসের।

* * *

রাত্রে তারা রাজপথে চ'লতো, দিনের বেলায়, পথ ছেড়ে আশে পাশে নির্জন মাঠ কি বন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চ'লতো। এক বস্ত্রে তারা বের হ'য়ে এসেছিল, কিন্তু সুকুমার সঙ্গে এনেছিল কিছু টাকা ও তার একটা পিস্তল

—বলা বাহুল্য, লাইসেন্স করা নয়। ক'লকাতা থেকে মোটরে আসবার সময় অভিজিৎ সঙ্গে এনেছিল অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েসনের প্রকাশিত পথের মানচিত্র, সেখানা সুকুমার সঙ্গে রেখেছিল। এই সম্বল নিয়ে তারা দিনের পর দিন রাতের পর রাত পথ চ'লেছিল। বিশ্রাম ক'রতে তারা কোনও ধর্ম্ম-শালায় ও যায় নি, শুয়ে প'ড়তো হয় গাছ তলায়, না হয় কোনও গরীব গ্রামবাসীর কুটিরে। দু এক দিন তাদের আশ্রয় নিতে হ'য়েছে বনের ভিতর। তখন তারা গাছের উপর উঠেই রাত কাটিয়ে দিয়েছে।

বিপদ তাদের হ'য়েছিল অনেক। বনের ভিতর বাঘ ভালুকের পথে প'ড়তে হ'য়েছে। তখন সুকুমারের পৌরুষ তার পূর্ণ গৌরবে প্রকাশিত হ'য়েছে। ছোট নাগপুরের এক জঙ্গলে দূর হ'তে চিতাবাঘের চিহ্ন পাওয়া গেল। সুকুমার অমনি সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি কতকগুলো শুকনো পাতা ও ডাল জড় ক'রে চারিদিকে মোটামুটি একটা বেষ্টনীর মত ক'রে ফেললে। যখন বাঘকে কিছু দূরে দেখা গেল, তখন সে সেই পাতার স্তূপে আগুন জেবলে দিয়ে মণিকাকে বাম বাহুতে বেষ্টন ক'রে ডান হাতে পিস্তল নিয়ে, দাঁড়িয়ে গেল। পিস্তলের গুলিতে বাঘ মারা যায় না, কিন্তু আবশ্যক হ'লে শব্দ ক'রে হয় তো ভয় দেখান যাবে এই ভরসায় সে দাঁড়াল। তার ব্যবহার দরকার হ'ল না—আগুন দেখে বাঘ দু এক বার মুখ ব্যাদান ক'রে ভয়ে পেয়ে পালিয়ে গেল।

তার পর আরও পাতা ও কাঠ জড় ক'রে তারা দুজনে সে আগুন জবালিয়ে রাখলো আর নিজেরা একটা গাছের উপর চ'ড়ে অবশিষ্ট রাত্রি কাটিয়ে দিলে। দিনের আলোয় তার পর পথ চলতে লাগলো কতকটা নির্ভয়ে।

চ'লতে চ'লতে তারা ভোর বেলায় এসে প'ড়লো হাজারিবাগ রোড ষ্টেশনের কাছে। ভোরের আলোয় সেখানকার প্রাকৃতিক শোভা তাদের মুগ্ধ ক'রলে। চারিদিকে পাহাড় গুলি ঢেউ তুলে চলেছে তাদের শ্যামল শোভা বিস্তার ক'রে। তরুণ সূর্য্যের স্নিগ্ধ আলোয় তাদের রূপ যেন ফেটে প'ড়ছে। আরও দূরে পরেশ নাথ পাহাড় তার উচ্চশৃঙ্গ তুলে নীরবে প্রচার ক'রছে তার গৌরব, যেন

কতকটা অবজ্ঞার সহিত তুচ্ছ ক'রছে বাচ্ছা বাচ্ছা গিরিশৃঙ্গগুলিকে। এ দৃশ্য দেখে তাদের চোখ জুড়িয়ে গেল, মণিকা অবাক্ বিস্ময়ে সুধু চেয়ে রইল। তাদের পথের ক্লান্তি দূর হ'য়ে গেল প্রভাতের মৃদু শীতল বায়ুতে।

সুকুমার ব'ল্লে, আর বনপথে গিয়ে কাজ নেই, লোকালয়ের ভিতর দিয়েই যাওয়া যাক। তাই স্থির ক'রে হাজারীবাগ রোড ষ্টেশনের কিছু দূরে এসে তারা উঠে প'ড়লো মোটরের রাস্তায়।

খানিকটা পথ তারা বাসে চড়ে গেল। তার পর একটা গ্রামে এসে আশ্রয় নিলে একটা বাড়ীতে, সেটা একটা সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ী ব'লে মনে হ'ল। বাড়ীর কর্ত্তা তখন বাড়ী ছিলেন না। গৃহিনী তাদের অবস্থা দেখে কৃপাপরবশ হ'য়ে ছোট একখানা কুঁড়ে ঘরে তাদের আশ্রয় দিলেন।

দিনের শেষে গৃহকর্তা সহর থেকে বাড়ী ফিরলেন, সুকুমার ও মণিকা তাদের কুটিরেই ব'সে দেখতে পেলো। লোকটি বেহারী ভদ্রলোক, ধুতি পরা কিন্তু তার গায়ে যে কোট ছিল তা' পুলিসের উর্দির অংশ। দেখে তাদের গা ছম্ ছম্ ক'রে উঠলো। তাদের কথাবার্তা শুনে এরা বুঝতে পারলে যে ভদ্র লোক পুলিসের কাজ করেন, সহরেই থাকেন, মাঝে মাঝে বাড়ী আসেন।

শঙ্কিত হ'য়ে উঠলো সুকুমার। বনে বাঘ ভালুকের ভয়, কিন্তু লোকালয়েও তাদের ভয় করবার মত শ্বাপদ আছে। আর পড়বি তো পড়, তাদেরই একটির মুঠোর ভিতর এসে প'ড়েছে তারা। অত্যন্ত সঙ্কুচিত হ'য়ে তারা ব'সে রইলো, যথাসম্ভব আত্মগোপন ক'রে। তার পর একটু অন্ধকার হ'তেই তারা নিঃশব্দে আবার পথে বের হ'য়ে প'ড়লো।

দ্বিপদের মধ্যে যে শ্বাপদ থাকে তাদের হাতে এদের আবার প'ড়তে হ'য়েছিল। তাদের মলিন বেশ ও অসংস্কৃত অস্নাত অঙ্গে তাদের স্বাভাবিক দেহ সৌষ্ঠব অনেকটা আচ্ছন্ন হ'লেও, মণিকার দেহশোভা একেবারে চাপা পড়ে নি। সেই রূপ লুব্ধ ক'রেছিল একাধিক পথচারীকে। বার দুই নারীমাংসলোভী দুর্বৃত্তের হাতে তাদের প'ড়তে হ'য়ে ছিল। বাঘের মত সুধু ভয় দেখিয়ে তাদের দূর করা সম্ভব হয় নি। সুকুমারের দেহের শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন

হয়েছিল। তাতে সেই দুর্বৃত্তদের লোভের পরিপূর্ণ শাস্তি সে দিতে পেরেছিল।

পাটনা থেকে বের হবার সাতদিন পরে একদিন মণিকা ব'ল্লে, "কোথায় চলেছি আমরা? এমনি পথে পথেই কি চলবো চিরকাল?"

সুকুমার ব'ল্লে, "ব'লতে সাহস ক'রছিনা এখনো, কিন্তু একটা আশ্রয়ের আশায়ই চ'লেছি। যেখানে যাচ্ছি, সেখানে আশ্রয় পেতে পারি মনে হ'চ্ছে; না পাই, তবে পথে পথেই ঘুরতে হবে হয় তো অনেক দিন।" তার পর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে ব'ল্লে, "তোমাকে বড় কষ্ট দিলাম মণিকা।"

মণিকা ব'ল্লে, "আর তুমি? বড় সুখে আছ, কেমন? তোমার এ কষ্ট কার জন্যে? আমার যদি দুর্মতি না হ'ত তবে তো তুমি পাটনায় পিসিমার বাড়ীতে পরম সুখে থাকতে!"

সুকুমার বল্লে "যতই তোমায় দেখছি মণিকা, ততই প্রশংসায় ভ'রে উঠছে মন। তোমার মত বীর নারীর কথা ইতিহাসে নেই। লক্ষ্মীবাই ঘোড়ায় চ'ড়ে যুদ্ধ ক'রেছিলেন যে কোনও পুরুষের মত। কিন্তু এই যে তোমার বীরত্ব যার কোনও জৌলুষ নেই, সহস্র বিপদে যাকে ক্লিষ্ট করেনা, এমন বীরত্ব কোনও বীরাঙ্গনা তোমার মত দেখায় নি।" ব'লে তাকে আদর ক'রে চুম্বন ক'রলে।

মণিকা হেসে ব'ল্লে, "এমন পুরস্কারের আশা থাকলে যে কোনও মেয়ে এর চেয়ে বেশী দুঃখ সইতে পারে।"

"কোথায় যাচ্ছি জিজ্ঞেস করছিলে? এখন ব'লতে পারি। এখান থেকে বেশী দূর নয় সে স্থান। সেখানে এক ভদ্রলোক আছেন, তাঁর সঙ্গে ক'লকাতায় আমার পরিচয় হ'য়েছিল। তিনি ভারতের অগ্নিযুগের এক কর্মী ছিলেন। পলাতক হ'য়ে এই খানে জঙ্গলের পাশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তার পর থেকে এই নিভৃত স্থানে বাস ক'রছেন। হয় তো তাঁর কাছে আশ্রয় পাব আমরা।"

আশ্রয়ের আশায় তাদের ক্লেশভার লঘু হ'য়ে গেল। পা চালিয়ে তারা এগিয়ে গেল। দিন শেষে তারা তাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছল।

বাড়ীখানি একটি বিশেষ সম্পন্ন গৃহস্থের আবাস ব'লে মনে হ'ল। পাকা

ঘর নয়, টিনে ছাওয়া মাটির ঘর অনেক গুলি। তার পর ধানের গোলা আছে, গরু মহিষ ভরা গোয়াল আছে, আর আছে বিস্তীর্ণ-সুশোভিত ফুল বাগান আর বিঘার পর বিঘা তরীতরকারীর বাগিচা।

গৃহস্বামী ধীরাজ বাঙালী। পালিয়ে এসে ঘুরে ফিরে শেষে এখানে তিনি আস্তানা বেঁধেছিলেন বিশ বৎসর আগে। কেবল জীবিকার জন্য কিছু চাষবাস ক'রতেন। কিন্তু কৃষিকর্মের লক্ষ্মী তার উপর কৃপা দৃষ্টি ক'রেছেন। এখন তাঁর জমী জমা অনেক. তা' ছাড়া কৃষিজাত শস্যের ব্যবসায়ও বিশেষ বিস্তৃত। বিস্তর শ্রমিক খাটে তাঁর কাছে।

মাঝে মাঝে ক'লকাতায় যেতেন তিনি! সেখানে তাঁর পরিচয় হ'য়েছিল সুকুমারের সঙ্গে, পরিচয়ে তিনি খুসী হ'য়েছিলেন।

যখন এরা এলো তখন তিনি দিনের কাজ শেষ ক'রে উঠানে একটা চৌকী ফেলে আরাম ক'রে তামাক খাচ্ছিলেন।

এদের অগ্রসর হ'তে দেখে তিনি হাকলেন, "কে?"

সুকুমার কাছে এল. মৃদু স্বরে তার পরিচয় বললে।

ভদ্রলোক ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে ব'ল্লেন. "এসো এসো, সুকুমার বাবু হঠাৎ—"

সুকুমার বাধা দিয়ে ব'ল্লে, "চুপ. সুকুমার কে? গোবিন্দ মাইতি।" তার পর চুপি চুপি ব'ল্ল. সে পলাতক. আশ্রয়প্রার্থী।

ধীরাজ বাবু বুঝলেন। তাদের দুজনকে একটা চাটাই পেতে ব'সতে ব'লে ব'ল্লেন. "ইনি?"

সুকুমার ব'ল্লে, "আমার স্ত্রী।"

"স্ত্রী! একি কুকর্ম ক'রেছ ভায়া? যে পথে পা দিয়েছ তাতে কি এ সব ঝামেলা বাঁধাতে আছে। গলায় পাথর বেঁধে কি ঝড়ের নদীতে সাঁতার কাটা যায়?"

সুকুমার ব'ল্লে. "না দাদা এ পাথর নয়. লাইফ বেল্ট। ভাসিয়ে রাখতে পারে, ডোবায় না। দেখবেন দুদিন গেলে।"

সেই দিন সুকুমার ও মণিকা ধীরাজ বাবুর মুনিস ও কামিন হ'য়ে

কায়েম হ'ল। গোবিন্দ মাইতি ক্ষেতেও কাজ করে, খাতাপত্রও রাখে, আর তার স্ত্রী লক্ষ্মী ঘরের কাজ করে।

ধীরাজ বাবুর সংসারে স্বচ্ছলতা ও প্রাচুর্য্য আছে কিন্তু শ্রীর বাহুল্য নাই, কেন না তিনি চিরকুমার। মণিকা এসে তাঁর গৃহকার্য্যের ভার নিতে তাঁর সম্পদের উপর অপরূপ একটা শ্রীর প্রলেপ প'ড়লো। কিছু দিন না যেতেই সে শ্রী ধীরাজকে মুগ্ধ ক'রলো।

(১৯)

ধীরাজ বাবুর এখানে সুকুমার ও মণিকা যেন এক নূতন জগতে এসে প'ড়লো। এতদিন তারা থেকেছে শহরে, কাজ যা ক'রেছে সব সহরে মজুর-দের নিয়ে,—প্রধানতঃ কলকারখনার মজুরদের নিয়ে। চাষের জমী বা চাষী মজুরদের সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান ছিল পুঁথিপড়া। তাই এখানে চাষীদের মাঝে চাষবাসের কাজের আবেষ্টনে এসে তাদের ধ্যান ধারণা অনেকটা ওলট-পালট হ'য়ে গেল।

ধীরাজ বাবুর এখানে যারা কাজ করে তারা প্রধানতঃ সাঁওতাল ওরাঁও বা বাউরী শ্রেণীর। আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে এদের পরিচয় খুব বিস্তীর্ণ নয়। শহর বাজার থেকে স্থানটী অনেক দূরে, এ দেশের যে শহর সেখানেও এদের গতিবিধি সামান্য। এদের কতক লোক ধীরাজ বাবুর জমীতেই বাস করে, ধীরাজ বাবুর তৈরী ধাওড়ায়, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকেরই নিজের বাড়ী ঘর আছে, সেখানে থাকে, আর এখানে দিন মজুরী করে।

ধীরাজ বাবুর বিস্তীর্ণ ভূমি প্রায় সম্পূর্ণ এক চাপে। তার পাশে একটা পার্বত্য নদী প্রবাহিত, তার আপাতক্ষীণ ধারার মুখে বাঁধ দিয়ে জমীর আদ্যোপান্ত সেচের ব্যবস্থা করা হ'য়েছে ; রাশি রাশি সার পাহাড়ের মত জমা হ'য়েছে। ধীরাজ বাবু সারাদিন ঘুরে ঘুরে সব জায়গায় কাজের তদারক করেন, যেখানে যা দরকার তার ব্যবস্থা করেন, আর তাঁর হাতে শেখান লোকদের দিয়ে কাজ আদায় করেন।

ফলে সমস্ত সম্পত্তিটা হ'য়ে উঠেছে যেন একটা সোণার থালা। নানা রকম ফসল, তরীতরকারী প্রভৃতিতে ক্ষেতগুলি বোঝাই। যুদ্ধের পর থেকে সব কৃষিজাতের দাম অসম্ভব বেড়ে ওঠায় তাঁর সম্পদ লাফিয়ে বেড়ে উঠেছে।—আজ তিনি একজন সম্পন্ন ব্যক্তি, তাঁর অধীনে প্রায় পাঁচ শো লোক কাজ করে।

তাঁর এ কীর্ত্তি সম্বন্ধে ধীরাজ বাবুর গর্ব তিনি শত মুখে ব্যক্ত ক'রতে সর্বদাই উন্মুখ। এ সম্পদ সৌভাগ্যের দান নয়, ষোল আনা তাঁরই কৃতিত্বের ফল একথা সদাসর্বদাই বল্লেন।

সুকুমার এই বিরাট কৃষিক্ষেত্র দেখে যখন বিস্ময় প্রকাশ ক'রলে তখন ধীরাজ ব'ল্লেন,

"এই দেখছো আজ. সোণার থালা! বিশ বছর আগে এখানে এলে দেখতে কাঁকড় ভাঙ্গা। একদানা ফসল এখানে উঠতে পারে, কোনও চারা এখানে গজাতে পারে তা' কেউ ভাবতো না। প্রথম যখন কাজে নামি, সবাই হেসেছিল। জলের দরে তখন জমি পেয়েছিলাম, তাই লোকে ভেবেছিল অপচয়! এ কাঁকর-ভাঙ্গা দিয়ে কী-ই বা হবে? এখন দেখে বন্ধুদের চোখ জুড়োয় শত্রুর চোখ টাটায়। কিন্তু, তাও বলি ভায়া, চোখের উপর এই দেখেও হাজারে একটা লোকেরও ইচ্ছে যায় না যে এমনি ক'রে তারাও চাষবাস করে। এই আমাদের দেশ!"

শুনে সুকুমার ভাবে। তার ভাবনা চিন্তার ধারা পূর্ব সংস্কারের সঙ্গে সংঘাত অনুভব করে—কিছু বলে না।

ধীরাজ, সুকুমারের মতে একজন বর্ধিষ্ণু "কুলাক," তাঁর সম্পদ, সুকুমারের অর্থনীতি অনুসারে পাওনা তার মজুরদের। তাদের দলের যা নীতি তা যদি জয়যুক্ত হয় তবে ধীরাজকে উচ্ছেদ ক'রে তার জমীর মালিকী দিতে হয় চাষীদের। সেটা যে সম্পূর্ণ নীতিসঙ্গত সে কথা সে বিশ্বাস করে। কিন্তু—খটকা লাগে।

ধীরাজের সঙ্গে তার চাষী মজুরদের সম্পর্ক খুব অন্তরঙ্গ। ঠিক মনিব চাকরের সম্পর্ক নয়, যেন একটা পরিবারের মত। তার কর্মীরাও তাঁকে তাদের

নিকট আত্মীয়ের মত মনে করে, সুখে দুঃখে, উৎসবে ব্যসনে ধীরাজ তাদের জীবনের ভাগ নেয়, তারাও ভাগ পায় ধীরাজের জীবনে। এদের এই আত্মীয়তার সম্পর্ক ঠিক মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্কের মত নয়। তবু—

কথায় কথায় একথাটা একদিন উঠে প'ড়লো—ধীরাজই তুললেন। তিনি শুনেছিলেন সুকুমার কমিউনিষ্ট। তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "আচ্ছা তোমরা, বিপ্লবী কমিউনিষ্টেরা চাও কী?—বিপ্লব চাও? কী জন্যে? আমরাও আমাদের কালে বিপ্লব করেছিলাম, তার একটা খুব সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল, ইংরেজের শাসন, বিদেশী শাসন ধ্বংস ক'রে দেশকে স্বাধীন করা। সে স্বাধীনতা তো এসে গেছে। এখন আবার কিসের বিপ্লব?"

সুকুমার যতদূর সম্ভব নরম ক'রে কমিউনিষ্ট কর্মপন্থা ও লক্ষ্যের পরিচয় দিয়ে গেল। রাশিয়ায় কমিউনিষ্ট বিপ্লবের ফলে সে দেশে কত কিছু হ'য়েছে সে সব খুব ব্যাখ্যান ক'রে ব'ল্লে। স্বাধীন ভারতে ধনিক রাজের প্রতাপের কথা ব'ল্লে।

ধীরাজ মনোযোগ দিয়ে শুনে ব'ল্লেন, "হুঁ! আমরা যে বিপ্লবের সূত্রপাত ক'রতে গিয়েছিলাম, তাতে এতটা ভেবে দেখি নি। জেনেছিলাম যে ইংরেজ আমাদের শত্রু, এদের দূর ক'রলেই হ'ল। কিন্তু তোমার কথা ঠিক, যে তাতেই দেশের দুঃখ দূর হবে না। যত দিন দেশের সব লোকের স্বাধীন ভাবে সুখে স্বচ্ছন্দে বাসের ব্যবস্থা না হবে, গরীবের দুঃখ দূর না হবে ততদিন কিছুই হবে না। কিন্তু ভায়া, একটু ভাববার কথা আছে। চাষী মজুর শ্রমিক সবাইকে চট্ ক'রে মালিক ক'রে দিলেই কি সব লেঠা মিটবে? তারা পারবে কি সব কর'তে? এই ধর না আমার এই ক্ষেত! এই সব সাঁওতাল ও ওরাঁও ভূমিজ এদের হাতে যদি এ সব জমীর মালিকী থাকতো, তবে পারতো, তারা কাঁকর-ভাঙ্গা ভেঙ্গে এই সোণার ক্ষেত তৈরী ক'রতে! আমি এদের জড়ো ক'রে চালনা ক'রে, বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ ক'রেছি তাই না এ ক্ষেত হ'য়েছে।"

সুকুমার ব'ল্লে, "রাশিয়ায় এ সমস্যা উঠেছিল, কিন্তু সেখানে তার সমাধানও হ'য়ে গেছে। প্রথম যখন সেখানে রেভোলিউশন হ'ল তখন শ্রমিকেরা

ভার নিলে সব বড় বড় কারখানার, চাষী-মজুরেরা মালিক হ'য়ে বসলো বড় বড় ফারমের। তাদের সে সব কাজ চালাবার মত শিক্ষা বা শক্তি মোটেই ছিল না, তাই ভয়ানক গোলোযোগ হ'ল। লেনিন তখন বুঝলেন যে ম্যানেজমেন্টের জন্য শিক্ষিত লোক চাই—তাই সব কারখানা সব বড় কৃষি-ক্ষেত্রের ভার দিলেন উপযুক্ত লোকের হাতে। কালেক্টিভ ফার্ম চালাবার জন্য সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত হ'ল। সব শ্রেণীর শ্রমিক চালাবার জন্য উপযুক্ত সরকারী কর্মচারী বহাল হ'ল। আপনি যে কাজ ক'রেছেন এটা নিতান্তই দরকার সেটা লেনিন ও ষ্টালিনও বুঝেছিলেন। কিন্তু তাঁরা এ কাজ করবার ভার স্বার্থান্বেষী মুনাফাখোর আঁতর প্রেণরের হাতে ছেড়ে দেন নি, সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত ক'রেছিলেন।"

"সে একটা উপায় হ'তে পারে বটে। কিন্তু তবু, ভাববার কথা এই যে সব মালিক যদি দূর ক'রে দেওয়া যায়, তবে অমনি কি সরকার তাদের কর্মচারী দিয়ে কাজ চালাবার উপযুক্ত হবেন? সরকারী কর্মচারীরা যোগ্যতায় হবে আমাদের তুল্য, ত্যাগে ও সততায় আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। হ'লে ভাল কথা, কিন্তু হবে কী?"

সুকুমার এর জবাব দিলে না ; বললে সুধু, "ভাববার কথা অনেকই আছে। আমরা ভাবছিও সে সব।"

এ সব আলোচনায় তর্কের মুখে সুকুমার অনেক কথাই বলে, কিন্তু পরে সে সব কথা নিয়ে মনের ভিতর নাড়াচাড়া করে।

এখানকার চাষী মজুরদের জীবন খুব নিবিড় ভাবে পরীক্ষা করবার অবসর পেয়ে সে যা দেখতে পেলো, তাতেও তাকে ভাবিয়ে দিলে।

এদের সঙ্গে কলের শ্রমিকদের অনেক তফাৎ। এরা সুধু মালিকের কাজ করে না, মাটির উপর তাদের দরদের সীমা নেই। ক্ষেতের ফসল, গাছের চারা এ সব জ্যান্ত জিনিষ, এদের তারা যেন স্নেহের চক্ষে দেখে, এদের সেবা ক'রে তারা আনন্দ পায়, সুধু মালিকের মজুরী—সুধু ভূতের বেগার—খাটছে এ তাদের মনে হয় না। তাদের হাতে বোনা গাছে যখন ফুল ফোটে বা ফল ধরে,

তাদের চাষ করা ক্ষেতে ফসল চন্ চন্ ক'রে ওঠে তাতে তাদের কি উল্লাস! তারা যে সে ফসলের মালিক নয়, এ কথা ভাবেও না তারা, উল্লাস হয়, তারা স্রষ্টা ব'লে—আনন্দ হয় যেমন বাপ মার আনন্দ হয় শিশু সন্তানের বৃদ্ধিতে।

ধীরাজ বাবু তার শ্রমিকদের সুখ দুঃখে নির্বিকার নন, আত্মীয়ের মত তাদের সব ব্যবস্থা করেন, তাদের কাজ শেখান, লেখাপড়া শেখান, আবশ্যক মত তাদের সেবা করেন। অন্ন বস্ত্রের বা রোগে চিকিৎসার অভাব তাদের নেই। আশে পাশে বস্তীতে যারা থাকে তাদের এতটা সুখ সুবিধা নেই, কিন্তু, সুকুমার দেখে অবাক হ'ল যে তারাও দুঃখ করে না, বেশ হেসে খেলে, নেচে গেয়ে তারা সুখে জীবন কাটিয়ে দেয়। তাদের অনেক অভাব সুকুমারের চোখে পড়ে, কিন্তু সে অভাবের বোধ তাদের নেই। তারা অল্পে সন্তুষ্ট, তাই তারা অভাব বোধ করে না।

সুকুমার জানে এদের এই সুখ বাস্তবিক বড় করুণ ব্যাপার। এদের জীবনের মান এতো খাটো, এদের জ্ঞানের পরিধি এত সংকীর্ণ যে এরা যে কষ্টে আছে তা' এরা জানেও না। চিরদিনই সে জানে যে এই দারিদ্র্যে নিপীড়িত পরিভূত, অধঃপতিতের এই তুষ্টি একটা মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি।

কিন্তু এদের ভিতর বাস ক'রে, এদের জীবন-যাত্রা দেখে এখন তার মনে খট্‌কা লাগলো। এদের সরল জীবনের এই যে সব ছোটখাট সুখ এটা কি সুধুই মর্মস্পর্শী অন্ধতা? এর একটা নিজস্ব মূল্য নেই কি? সম্পন্ন শহরে, যেখানে লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অনেক সমৃদ্ধ আয়োজন আছে, সেখানে লোকের বিশ্রাম নেই। তাদের জীবনের মান অনেক উঁচু—সেই জীবন লাভ ক'রতে আর তা' রক্ষা ক'রতে সবারই খাটুনির অন্ত নেই। সারাদিন তাদের ব্যস্ততায় কেটে যায়। —ঠিক এদের মত আরাম ক'রে বিশ্রাম করবার অবসরও তাদের কম, এই আরাম করবার মত মানসিক তৃপ্তিটুকুও তাদের নেই।

তার আদর্শ রাষ্ট্র হ'ল সেই রাষ্ট্র যেখানে প্রত্যেক লোক তার সমুদয় শক্তি দিয়ে খাটবে সবার সমৃদ্ধি ও সুখ বাড়াবার জন্য, রাজশক্তি সুনিয়ত প্রণালীতে তাদের সমস্ত শ্রমশক্তি পরিচালিত ক'রবে, দেশের সবার সুখ সমৃদ্ধি

বাড়াবার জন্য।—এখন সে ভাবলে, তাতে কি সুখ বাড়বে জগতের? সন্দেহ হ'তে লাগলো।

রাশিয়ার পাঁচসালা প্লানের কথা মনে হ'ল। মালিক বা আঁতের প্রেণর যে কাজ ক'রে মুনাফা খায়, সেখানে সে কাজ করে সরকারী কর্মচারী বাঁধা বেতনে। বাড়তি লাভ যেটা সেটা যায় সরকারের তহবিলে, খরচ হয় জনতার হিতের জন্যে। কিন্তু এখন এক একবার তার সন্দেহ হয় যে ধীরাজ বাবুর এ কাজে তাঁর যে দরদ, মাইনে করা সরকারী কর্মচারীর সে দরদ হবে কী? এখানে মালিক ও মজুরের মধ্যে যে আত্মীয়তাব সম্পর্ক, সেটা কি সরকারী কর্মচারী বা ওভারসিয়ারের হবে?

মালিক মজুর উভয়ের দরদের বহু পরিচয় সুকুমার রোজ পায়। একটা গরুর কোনও অসুখ বা কষ্ট হ'লে সে গরুর কাজ যে করে সে ছুটে আসে ধীরাজের কাছে, ধীরাজ অমনি ছুটে যান আর সবাই মিলে দরদ দিয়ে তার সেবা করেন, ঠিক যেমন করে বাপ মা তাদের ছেলে পিলে নিয়ে। মুনিসদের ছেলেপিলে নিয়ে নিঃসন্তান ধীরাজ খেলাধুলা করেন, যেন তারা তাঁরই ছেলে পিলে। ধীরাজের কোনও অসুবিধা, কোনও যন্ত্রণা হ'লে তাঁর লোকেরা ছুটে আসে সাহায্য ক'রতে নিকট আত্মীয়ের মত।

জমীর একদিকে ধীরাজ একটা ফল বাগান ক'রছিলেন। অনেক গাছ বড় হ'য়েছে, অনেক চারা রোজ লাগান হ'চ্ছে। যারা সেখানে কাজ করে সে মজুরদের কী উৎসাহ সে কাজে। রোজ তারা, প্রত্যেকে নিজের লাগান চারাটিকে কি গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করে! একদিন একজন মজুরকে সুকুমার দেখতে পেলো একটা চারার কাছে—একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে সে, আর কোনও কিছুই সে লক্ষ্য ক'রছে না। সুকুমার কাছে গিয়ে ব'ললে, "কী ভাই, কী দেখছো?"

কথা শুনে তার যেন চমক ভাঙলো। সে সুকুমারের দিকে চাইলে উদাস দৃষ্টিতে, ব'ল্লে, "দেখছি ভাই চারাটা কিছুতেই বাঁচান গেল না, কেমন শুটকে হ'য়ে যাচ্ছে দেখছো?"

চেহারাটা তার যেন শিশুর মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়ান আত্মীয়ের মত।

তার মনে প'ড়লো, ক'লকাতায় ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাষ্ট ও কর্পোরেশন অনেক গাছের চারা লাগান, সেই হাজার হাজার গাছের দেখা শোনা করবার ভার অনেকগুলি মালির হাতে, তাদের দেখাশোনা করে ওভারসিয়ার প্রভৃতি কর্ম-চারী। সেখানে কোনও গাছকে তো কেউ এমন দরদ দিয়ে সেবা করে না, ম'রে গেলে তাকে ব্যক্তিগত ক্ষতি ব'লে মনে করে না। সুধু একটা জড় প্রাণ-হীন কর্মচারী যন্ত্রের কাজে এই দরদ এই human touch তো দেখা যায় না। এদের এ দরদ সুধু লাভ লোকসানের খতিয়ানের নয়, প্রফিট মোটিভ প্রণোদিত নয়, এটা মানুষের অন্তরের দরদ।

সুকুমারের মনে হ'লো যন্ত্রের মত মানুষকে সুধু একটা সিষ্টেম দিয়ে চালনা ক'রলে তাতে এ human touch থাকবে কী? যদি না থাকে, তবে তাতে ভাল না মন্দ হবে?

যুক্তি দিয়ে অনেক সময় সুকুমার নিজের মনকে বোঝায় যে ব্যাপক ভাবে সর্বমানবের হিতের জন্য কাজ ক'রতে হ'লে সিষ্টেমে বাঁধা কলের মত কাজের পদ্ধতি ছাড়া উপায় নেই। বোঝায় যে, সব মালিক তো ধীরাজ নয়, হ'তে পারেও না। বেশীর ভাগ মালিকের দৃষ্টি সুধু লাভের দিকে, দরদ তাদের যদি থাকে সে অতি গৌণ।

তবু সন্দেহ থেকে থেকে মনে জোর ধাক্কা দেয়।

সারাদিনের কাজের পর চাটাই-পেতে দাওয়ায় ব'সে সে ধীরাজ বাবুর সঙ্গে এমনি সব নানা কথার আলোচনা করে, বিশেষ ক'রে কমিউনিষ্ট পার্টির কার্য্য-পদ্ধতির কথা। মণিকা পাশে ব'সে শোনে সুধু। বাগ্মীতার জোরে সুকুমার তার দুটি শ্রোতাকেই স্রোতে ভাসিয়ে নেয়। কিন্তু তবু—তার নিজের মনের তলায় এখন সন্দেহ খোঁচা মারে।

ধীরাজ বাবু একদিন শেষে ব'ল্লেন, "তোমার কথা শুনে ভাই কমিউনিষ্ট-দের উপর আমার খুবই শ্রদ্ধা হ'চ্ছে। কিন্তু দুঃখও হ'চ্ছে। এত বিদ্যা এত

বুদ্ধি তোমার, দেশের মঙ্গলের জন্য এত উপায় তুমি জান, এসব যে এখানে লুকিয়ে থেকে কেবলি মাঠে মারা যাচ্ছে ভাবতে দুঃখ হয়।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুকুমার বলে, "কী ক'রবো? বরাত! হয় তো আমার দিন আসবে একদিন।"

ধীরাজ বল্লেন, "এলে ভাল। কিন্তু ভাই, আমি ঘরপোড়া গরু, তাই ভরসা হয় না বড়। আমি যখন এখানে প্রথম আসি তখন আমিও ভাবতাম, আজ আমি পালিয়ে আছি, আমার দিন আসছে। —কিন্তু এলো কই? এই খানেই তো প'ড়ে থাকতে হ'ল আমার। ভারত স্বাধীন করবার যে ব্রত আমি নিয়েছিলাম, সে ব্রত প'ড়েই রইলো। ভারত স্বাধীন তারাই ক'রলে যারা আমাদের বিপক্ষে ছিল, সশস্ত্র বিপ্লবে যাদের আস্থা ছিল না। আমার শক্তির সঙ্গে আমার ব্রতের বিচ্ছেদ হ'য়ে রইলো স্থায়ী। তাই ভয় হয়।"

"ভয় করি নে দাদা। আমার হাতে কোনও কাজ না হয়, কোনও দুঃখ নেই, যদি কাজটা হ'য়ে যায়। যতটুকু কাজই ক'রে থাকি আমি, সেটুকু হয় তো অপরের হাতে গিয়ে ফলবান হবে।"

"তবু তোমার বেলায় সেইটুকু ভেবে আমার তৃপ্তি হয় না। এত বড় শক্তি তোমার এমনি ক'রে অপচয় হবে ভাবতে দুঃখ হয়।"

"কিন্তু আপনার বেলাও তাই হয় নি কি?"

"না বোধ হয়। আমার নিয়তি বোধ হয় আমাকে বড় দয়া ক'রে এনে দাঁড় করিয়েছে আমার প্রকৃত শক্তির ক্ষেত্রে। যে শক্তি আমার আছে ভেবেছিলাম তা' হয় তো আমার ছিল না, কিন্তু যে শক্তি আমার সত্যি সত্যি ছিল সেটা ঠিক এই ক্ষেত্রে প'ড়ে পরিপূর্ণরূপে সফল হ'য়েছে। কাঁকরভাঙ্গায় আমি সোণার ফসল ফলিয়েছি, বন্ধ্যা পৃথিবীকে ফলগর্ভা ক'রে তার নূতন শোভা ফুটিয়ে তুলেছি, এটাকে খুব কম সাফল্য ব'লে আমি মনে করি না। স্বাধীনতার অভিযানে সৈনিকের ব্রত বঞ্চিত হ'য়েছি তাতে খুব ক্ষতি বোধ ক'রছি না।"

আর একদিন কথায় কথায় ধীরাজ বাবু ব'ল্লেন, "আমার প্রথম যৌবনের দিনে অনেকটা তোমার মত কথা ব'লতেন মাঝে মাঝে একজন—কেউ তার

কথা গ্রাহ্য ক'রতো না। এখন তোমার কথা শুনে মনে হ'চ্ছে, তাঁর কথাগুলো ঠিকই ছিল। তুমি হয় তো তাঁর নামও শোন নি, তাঁর নাম শশাঙ্ক বাবু।"

মণিকা লিখেছে, "একথা শুনে সুকুমারের মুখ কী যে গর্বে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো সে কথা কী ব'লবো দাদু! যদি তখন তাকে দেখতেন তো বুঝতেন!"

সুকুমার উল্লসিত হ'য়ে ব'ল্লে, "তিনি আমার ঠাকুরদাদা!"

"শশাঙ্ক বাবুর নাতি তুমি? বেশ বেশ। ঠাকুর্দ্দার যোগ্য নাতি তুমি! তিনি কি বেঁচে আছেন?"

"আছেন, আশা করি। এতদিন তো তাঁর খবর পাই নি। কেমন আছেন কে জানে?"

আর একদিন ধীরাজ ব'ল্লেন, "দেখ ভাই, যদি কিছু মনে না কর একটা কথা বলি। তোমাদের কমিউনিষ্ট পার্টি বিপ্লব চায়। সে বিপ্লব যদি সফল হয়, যদি প্রকৃত সাম্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, ভাল কথা। কিন্তু উপস্থিত ঠিক সফল বিপ্লব হবার সম্ভাবনা কতটুকু? কতদিনে সেটা হবে? হবে কি না তাই বা কে জানে? এ অবস্থায় কেবল সেই বিপ্লবটাকেই এক লক্ষ্য ক'রে তোমাদের জীবন ক্ষয় ক'রবে সেইটেই ভাল, না দেশের মঙ্গলের জন্য আজ যে হাজার হাজার কাজ হাতের গোড়ায় প'ড়ে আছে সে দিকে একটু বেশী নজর দেওয়াই ভাল। বিপ্লব চাও, চাইতে পার, কিন্তু তার আগে দেশ যদি মরে যায় তবে সে বিপ্লব ক'রে কী হবে? কাকে নিয়ে কী ক'রবে? তাই মনে হয়, অন্ততঃ এখন, যখন দেশের অন্ন বস্ত্র স্বাস্থ্য শিক্ষার লক্ষ লক্ষ প্রয়োজন র'য়েছে, যখন গরীব অন্নহীন দেশবাসীকে উন্নত জীবন লাভের জন্য তৈরী করবার, তাদের শক্তি বাড়াবার জন্য আশু কর্তব্য রাশি রাশি র'য়েছে, তখন বিপ্লবের চেষ্টা আপাততঃ স্থগিত রেখে শান্তির পথে দেশকে যতদূর সম্ভব টেনে তোলবার চেষ্টা করাটাই কি সঙ্গত নয়?"

সুকুমার ব'ল্লে, "সে কাজ তো র'য়েইছে। সে কাজ করবার জন্য তো কোটি কোটি লোক র'য়েছে। কিন্তু বিপ্লবের শঙ্কাকুল পথে যাবার যোগ্য

লোক কম—সেই লোকদের একাগ্রভাবে সেই সাধনা ক'রতেই শেখাতে হবে।"

ধীরাজ ব'ল্লেন, "আমি এ কথায় সম্পূর্ণ সায় দিতে পারছি নে ভাই। আমিও তোমার বয়সে এমনি ভাবতাম। বিপ্লব আমার রক্তের ভিতর টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটতো। কিন্তু এখন যতই বয়স হ'চ্ছে ততই মনে হ'চ্ছে যে জাতির জীবন, সমগ্র পৃথিবীর জীবনের পক্ষে শান্তির প্রয়োজনটাকে যত তুচ্ছ ক'রেছিলাম তখন, ততটা তুচ্ছ করবার বস্তু সে নয়। বিপ্লব ও সংগ্রাম মানুষের অনেক সময় ক'রতে হ'য়েছে—সে সাময়িক প্রয়োজনে, কিন্তু মানুষের সমাজের স্থিতি বৃদ্ধি সুখ সৌভাগ্য সৃষ্টি ও রক্ষা করবার জন্য শান্তি খুব বেশী প্রয়োজন।"

হেসে সুকুমার ব'ল্লে, "আমারও যখন আপনার মত বয়স হবে তখন আমিও হয়তো আপনার মতই ভাববো, কিন্তু আমি এখন অত্যন্তই যুবক।"

তখন হেসে কথাটা উড়িয়ে দিলে বটে সুকুমার, কিন্তু ধীরাজ বাবুর কথা নিয়ে নিজের মনে সে অনেকটা তোলপাড় ক'রলে।

শেষে একদিন মণিকার সঙ্গে কথায় কথায় সে ব'ল্লে, "আমার মনে হ'চ্ছে মণিকা, যে আমাদের পার্টি এখন যে পথে চলছে, সে পথটা বোধ হয় ভুল। এখন ঠিক বিপ্লবের সময় হয় তো নয়।" তার পর আর একদিন সে ব'ল্লে, "এমনি ক'রে পালিয়ে থেকে নিজেকে অপচয় ক'রে কী উপকার ক'রছি আমি দেশের? এর চেয়ে"—ব'লতে ব'লতে সে থেমে গেল।

এর পর একদিন সুকুমারের অসাক্ষাতে ধীরাজ মণিকাকে ব'ল্লেন, "দেখ মা, সুকুমারকে এমনি ক'রে নষ্ট হ'তে দেখে আমার বড় দুঃখ হয়। আমি তো তাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা ক'রছি—পারছি না। তুমি একটু চেষ্টা করো মা।"

মণিকা ব'ল্লে, "না দাদা, আমার সাহস হয় না।"

ধীরাজ বাবু এর পর রোজ এই কথা নিয়ে আলোচনা ক'রতেন। সুকুমার যতই তর্ক করুক তার মনের প্রাকারে যে ফাটল ধ'রেছে ক্রমে তিনি তা বুঝতে পারলেন। তখন তিনি মণিকার সঙ্গে যুক্তি ক'রে তাকে দিয়ে আমার কাছে

চিঠি লেখালেন। সে চিঠি নিয়ে ক'লকাতায় আসবার আগে সুকুমারকে ব'ল্লেন,

"ক'লকাতায় যাচ্ছি ভাই। যদি পারি তোমার ঠাকুর্দ্দার সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর খবর তোমায় জানাব।"

সুকুমার ভারী খুসী হ'য়ে গেল।

(২০)

এই কাহিনীর মোটামুটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে মণিকা ব'ল্লে,

"আপনাকে আমি শেষ যে চিঠি লিখি তার পর দিন খবরের কাগজে আমরা প'ড়লাম পূর্ব-বঙ্গের বীভৎস কাণ্ডের কাহিনী।"

সে সংবাদ জেনে তার মূর্তি হ'য়ে উঠলো ভয়াবহ। অনেকক্ষণ নীরবে চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে ভেবে সে শেষে ব'ল্লে, "আর পালিয়ে থাকবার দিন নেই মণিকা! কাজ ক'রতেই হবে, যা থাকে কপালে। আমি চল্লাম বরিশাল।"

মণিকা ব'ল্লে, "আমিও যাব।"

তার অবস্থা লক্ষ্য করে সুকুমার ব'ল্লে, "এখন সে হয় না। তুমি ক'লকাতায় কোনও হাসপাতালে যাও।"

ব'লে সে চ'লে গেল। তার আশ্রয়দাতা মণিকাকে পেঁাছে দিয়ে গেছে আমার বাড়ী।

আচ্ছন্ন হ'য়ে শুনলাম মণিকার সে দীর্ঘ কাহিনী। শুনে স্তব্ধ হ'য়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

ভাবতে আশ্চর্য্য বোধ হ'ল আমার যে আমি এক মুহূর্ত্ত আগে যা ভাবছিলাম, ঠিক সেই ভাবনা সেই আকাঙ্ক্ষা কেমন ক'রে দূরত্বের বাধা লঙ্ঘন ক'রে, মূর্ত হ'য়ে উঠলো সুকুমারের অন্তরে এতদূরে। আমি যা কর্তব্য ব'লে জেনে তা' করবার অশক্তির বেদনায় পীড়িত হ'য়েছিলাম সেই কর্তব্য

কোন অলক্ষ্য বিধানে অনুপ্রাণিত ক'রলো সুকুমারকে আমার ভাববার আগেই। এ কী এক অপূর্ব টেলিপ্যাথি তার আমার ভিতর।

চমক ভেঙ্গে দেখলাম, মণিকা স্তব্ধ হ'য়ে নত নেত্রে ব'সে আছে তখনও।

জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "তোমার বাড়ী কোথায়? বাবা আছেন?"

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে ব'ল্লে, "আছেন। কলকাতায়ই থাকেন তিনি—কিন্তু দয়া ক'রে তাঁর কাছে একথা জানাবেন না।"

আকুল কণ্ঠে ব'ল্লে সে—"তার চেয়ে—আচ্ছা আমি এখন যাই।"

আমি স্নিগ্ধ কণ্ঠে ব'ল্লাম, "ভয় পেয়ো না দিদি, আমি তোমার অনিষ্ট ক'রবো না কিছু। কিন্তু তোমার বাবার নাম ব'ল্লে কিছু দোষ আছে কি?"

অনেক্ষণ দ্বিধা ক'রে নাম একটা ব'ল্লে সে। চেনা চেনা মনে হ'ল নামটা। মনের ভিতর হাতড়াতে লাগলাম। শেষে হঠাৎ মনে হ'ল। বিস্ফারিত নেত্রে তার দিকে চেয়ে ব'ল্লাম, "তুমি সুধাকান্তের নাতনী?"

কেঁদে সে আমার পায়ে লুটিয়ে প'ড়ে ব'ল্লে, "দয়া করুন আমায়, তাঁকে আমার খবর জানাবেন না।"

আমি তাকে আশ্বস্ত ক'রে ব'ল্লাম, "ভয় নেই দিদি, এখন আমি কিছুই জানাব না।"

টেলিফোন আমার কাছেই থাকে। সেটা তুলে আমি একজনকে আসতে ব'ল্লাম। তারপর রিসিভার ছেড়ে দিয়ে মণিকাকে ব'ল্লাম, "তুমি সুস্থির হ'য়ে ব'সো। তোমার কোনও ভয় নেই। একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রবো? তোমার এক দিদিও তোমার সঙ্গে গিয়েছিলো কি?"

মুখ নত ক'রে মণিকা ব'ল্লে, "না। সে যে চ'লে গেছে তা' আমি তখন জানতামও না। তবে সে ব'লেছিল তার আগের দিন যে বোম্বাইয়ে সে একটা কন্ট্রাক্ট পেয়েছে, সেখানে যাবার কথা। হয় তো সেটা মিছে কথা।"

কথায় কথায় এসে প'ড়লো লেডী ডাক্তার—যাকে আমি টেলিফোন ক'রেছিলাম।

ডাক্তারকে আমি ব'ল্লাম, "এসো মা, এই পেসেন্টটিকে একবার পরীক্ষা কর, যাও মণি ওঁর সঙ্গে পাশের ঘরে।"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা ক'রলে, "কে ইনি?"

"ইনি সুকুমারের স্ত্রী। বাবু একে গোপনে বিয়ে ক'রে এনে, আপাততঃ আমাকেই সওগাত দিয়ে গেছেন। কি বলিস দিদি?" ব'লে মণিকার দিকে চেয়ে হাসলাম।

ব'লবে কি সে? বিস্ফারিতনেত্রে সে শুধু আম্মার দিকে অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলো। বোধ হয় অবাক হ'ল সে এই ভেবে যে আমি মিছে কথা বলেও এমনি ক'রে তার মান রক্ষা ক'রলাম!

আমিও অবাক হ'লাম।

কোথায় রইলো আমার চিরজীবনের সত্যসাধনা ও অটুট সত্যনিষ্ঠা, কোথায় রইলো কঠোর নীতি-নিষ্ঠা! কোথায় নিখোঁজ হ'য়ে তলিয়ে গেল সে সব স্নেহ করুণার বিরাট বন্যায়—সহজ মানবতার দুর্দান্ত তরঙ্গে!

ডাক্তার যতক্ষণ মণিকাকে পরীক্ষা ক'রলো ততক্ষণ আমি অবাক হ'য়ে ভাবতে লাগলাম, এই কি সেই আমি, কেশব সেনের যুগের সুনীতিতে যার দীক্ষা হ'য়েছিল, সারাজীবনের অক্লান্ত সাধনায় যে অটুট সত্যনিষ্ঠা লাভ ক'রেছিল?

ডাক্তার এসে ব'ল্লেন, "প্রসবের খুব বেশী বিলম্ব নেই—দু' চার দিনের মধ্যেই হবে।"

ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে ব'ল্লাম, "তবে নিয়ে যাও একে—এখনি নার্সিং হোমে ভর্ত্তি ক'রে দাও গে।"

তার পর হঠাৎ মনে প'ড়লো একটা কথা। বল্লাম, "হ্যাঁ, একটা কথা! এরা পুলিসের নজরবন্দী লোক, এর পরিচয়টা গোপন রেখো। ছদ্মনামে ভর্ত্তি ক'রে নিও একে।"

ডাক্তার ব'ল্লে "আচ্ছা।"

আবার ব্যস্ত হ'য়ে ব'ল্লাম, "কেমন দেখলে? ভয়ের কোনও কারণ আছে কি?"

"আজ্ঞে না, যতদূর দেখছি তাতে সহজ সুপ্রসব হবে ব'লেই মনে হচ্ছে।"

"তা ভাল, তবু একবার ডাঃ মিত্রকে ডেকে দেখিয়ে রেখো—যদি কোনও দরকার হয়!"

"আজ্ঞে আচ্ছা।"

"আর নার্স, আজ থেকেই রেখে দিও—নইলে কষ্ট হবে ওর।"

একশ' টাকার একখানা নোট তাঁর হাতে দিয়ে ব'ল্লাম, ওর কাপড়চোপড় জিনিষ পত্র যা' দরকার কিনে দিও।

আমার কথাবার্তা শুনে মণিকা বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গিয়েছিল। সে শুধু ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলো আমার দিকে।

তাকে বিদায় দিবার জন্য আমি উঠে দাঁড়ালাম।

ঢিপ ক'রে আমাকে প্রণাম ক'রে উঠে মণিকা হঠাৎ আমার বুকে মাথা রেখে লতিয়ে গেল আমার গায়, আর অঝোরে কাঁদতে লাগলো। আমি তাকে বুকের ভিতর সাপটে নিলাম।

একটা অপূর্ব পুলকের শিহরণ ব'য়ে গেল আমার চিত্তে, স্নেহরসে পরিপ্লুত হ'য়ে গেল আমার অন্তর। একবারও মনে হ'ল না যে মণিকা পাপিষ্ঠা!

শেষে চোখ মুছে যখন মণিকা দাঁড়াল তখন আমি তাকে রহস্য ক'রে ব'ল্লাম, "তুই তো সহজ ডাইনী ন'স মেয়ে! বিরাশী বছরের বুড়োকেই কাবু ক'রে দিলি! সুকুমারের অপরাধ কী?"

একটু ম্লান হাসি হেসে সে ব'ল্লে, "অপরাধ আমার, কিন্তু—আপনি যে দেবতা, তাই—" ব'লতে আবার তার চক্ষু জলে ভরে গেল। আবার প্রণাম ক'রে সে ব'ল্লে, "আশীর্বাদ করুন দাদু, আপনার নাতির যেন মঙ্গল হয়।"

আশীর্বাদ ক'রলাম, সুকুমারকেও মণিকাকেও।

গাড়ীতে উঠে মণিকা সাশ্রুনয়নে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলো যতক্ষণ দেখা গেল। আমিও চেয়ে রইলাম।

* * *

সে চ'লে গেলে আমি আবার শুয়ে প'ড়লাম ইজিচেয়ারে। কিন্তু আমার এতদিনের পুঞ্জীভূত অবসাদ যেন হঠাৎ লুপ্ত হ'য়ে গেল। পাপিষ্ঠা মণিকা; সেজন্য তার শাস্তি হওয়া উচিত, এই ছিল আমার ধর্ম-বুদ্ধির বিচার। কিন্তু সে পাপিষ্ঠা যখন, এমনি ক'রে সামনে এলো, তাকে ক্ষমা ও প্রীতি ছাড়া কিছুই দেবার কথা মনে হ'ল না। প্রীতিতে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে গেল অন্তর।

* * *

আমি ফুরিয়ে গেছি, বেঁচে থেকে আমার কোনও সার্থকতা নেই, ভেবেছিলাম আমি। হঠাৎ একটা অপূর্ব সার্থকতার আনন্দ শিহরণ এখন বয়ে গেল আমার রক্তের ধারায়।

সামনে চেয়ে দেখলাম, সেই বৃদ্ধ ফলহীন আমগাছ দাঁড়িয়ে আছে—তার ছায়ায় শুয়ে একটি গাভী পরম আদরে তার বৎসরে গা চাট্‌ছে।

মনে হ'ল আমিও এই গাছেরই মত। ফল আমার ফুরিয়ে গেছে, কিন্তু —ছায়া দেবার, ভালবাসবার শক্তি আছে আমার।

আমি এখনো আছি।